সি পি আই (এম) এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে

২

অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

দেশের কথা পাবলিকেশনস্‌
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৪

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্‌
মেলারমাঠ ○আগরতলা

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

[১৯২০ সালে তেইশ বছর বয়সে রফিক আহমেদ ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। এখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। চল্লিশ বছর পরে তাঁর মুখে তাঁর ভ্রমণের কথা শুনে আমি তা বাংলায় টুকেছি, তিনি বলেছেন উর্দুতে। এটা অবশ্য পুরোপুরি অনুলিখন নয়। এমনভাবে তাঁর কথাগুলি টুকেছি যেন দরকার হলে আমার নিজের ভাষায় আমি একটি লেখা দাঁড় করাতে পারি। এই বিষয়ে কিছু লেখা আমার পক্ষে অন্য একটি সুবিধাও আছে। রফিক আহ্‌মদের ভ্রমণের সাথীদের অনেকে পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁদের দুজনের সঙ্গে আমি জেলও খেটেছি। তাঁদের মুখে একাধিকবার তাঁর ভ্রমণের কথা আমি শুনেছি। তখন অবশ্য কোনও লিখিত নোট আমি রাখিনি। তাই, রফিক আহ্‌মদের মুখে আবারও কথাগুলি শুনে নিয়ে আমি লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। আগে যা কবার শুনেছি তা আবার নতুন করে শোনার জন্যে আমি তাঁকে কষ্ট দিয়ে গত জুলাই মাসে কলকাতায় আনিয়েছিলাম।

রফিক আহ্‌মদের ভ্রমণের সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছেন, কেউ কেউ রাজনীতি করেছেন, আবার দেশ ভাগ হওয়ার সময়ে প্রায় সকলেই পাকিস্তানের ভাগে পড়েছেন। একমাত্র রফিক আহ্‌মদ বর্তমান ভারতের ভাগে পড়েছেন। তাঁর বাড়ি ভোপাল শহরে।

চল্লিশ বছর পরে স্মৃতিচারণ করলে তারিখের ভুল হওয়া অনিবার্য। বিদেশের দুর্গম এলাকার পথঘাট মনে রাখা প্রায় অসম্ভব। সোভিয়েত ভূমির মধ্য এশীয় অঞ্চলে আজ যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তাতে পুরানো জায়গাগুলি চেনাও মুশকিল। এই সব দিক থেকে ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু ক্রটি থাকবে তবুও এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগের অনেক খবর এতে পাওয়া যাবে।

ব্যক্তির মূল্যায়নে কোথাও রফিক আহ্‌মদের সঙ্গে আমার মতের গরমিল হলে, কিংবা তিনি কোনও কথা বলেননি মনে হলে আমি নিজের কথা এই বন্ধনীর [ ] ভিতরে বলেছি। ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে আমি রফিক আহ্‌মদকে উত্তমপুরুষরূপে ব্যবহার করেছি। — *লেখক*]

যাত্রার শুরু

১৯২০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে দিল্লিতে একটা খিলাফত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। আমার বড় ভাই কবির আহ্‌মদ আর আমি এই কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যে ভোপাল হতে দিল্লি যাই। আমাদের বাড়ি ভোপাল শহরে। এই সম্মেলনে হিজরতের ওপরেই বেশি বক্তৃতা হল। পাঞ্জাবের মাওলানা সানাউল্লা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আরও কে কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এখন ভালো মনে নেই। হিজরত আন্দোলনের বড় প্রবক্তা ছিলেন গোলাম মুহম্মদ নামে একজন। তিনি সম্ভবত অমৃতসরের বাসিন্দা ছিলেন। শুনেছি এই আন্দোলনে তলে তলে মাওলানা আবুল কালাম আজাদেরও সমর্থন ছিল।

হিজরত শব্দের অর্থ ক্রমাগত অত্যাচারের হাত হতে দেশত্যাগ করে পলায়ন। যাঁরা হিজরতের প্রচার করছিলেন তাঁরা বলছিলেন ইংরেজের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। তুরস্কের ব্যাপারে ব্রিটিশ যত ওয়াদা করেছিল তার কোনো ওয়াদাই পালিত হয়নি। এই হতাশা হতেই হিজরত আন্দোলনের শুরু হয়। এই সময়ে আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লা ঘোষণা করলেন যে যাঁরা ভারতবর্ষ হতে হিজরত করবেন আফগানিস্তানে তাঁদের স্বাগত জানানো হবে। বাদশাহের মনে ধারণা জন্মেছিল যে বড় বড় মগজওয়ালা লোকেরা হিজরৎ করবেন। তাঁর দেশে মগজওয়ালা লোকের দরকার ছিল।

আমরা দু-ভাই স্থির করে ফেললাম, আর বাড়ি ফেরা নয়, — দিল্লি হতেই আমরা আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে যাব। কনফারেন্সে মালিক লাল মুহম্মদ নামে গুজরানওয়ালার একজনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি বললেন, আমাদের যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি করে দিবেন। প্রথমে আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলাম। পেশোয়ারের একজনের নামে একখানা পত্র দিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু পেশোয়ারে পৌঁছে ওই ঠিকানায় ওই নামের কোনও লোকের পাত্তাই পাওয়া গেল না। ওই নামের কোনও লোক ওখানে কোনও সময়ে ছিলেন বলেও স্থানীয় লোকেরা খবর দিতে পারলেন না। সৌভাগ্যক্রমে হাজি জান মুহম্মদ নামে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। তিনি আমাদের সব রকমের সাহায্য করলেন। পথঘাট সম্বন্ধেও উপদেশ ছিলেন। আমরা আবার রওয়ানা হলাম। জমরুদে পৌঁছানোর পরে ব্রিটিশ সরকারের তহসিলদার আমাদের নানান রকমের প্রশ্ন করলেন। আমার বড় ভাই কবীর আহ্‌মদ যখন জানালেন যে তিনি ভোপাল রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারী তখন তাঁকে আর যেতে দেওয়া হল না। আমায় এগিয়ে যাওয়ার হুকুম তিনি দিলেন। একলাই যাত্রা করলাম আমি। আমার পকেটে তখন মাত্র ছয়টি টাকা ছিল। পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলাম। লান্ডিকোটাল হয়ে প্রথম আফগান এলাকা ডাককায় পৌঁছাই। এখানে কোনওরকম বাধার সম্মুখীন আমায় হতে হল না। এগিয়ে গেলাম জালালাবাদের পথে। জেনারেল নাদির খান তখন জালালাবাদের ভার নিয়েছিলেন। [পরে তিনি বাচ্চা-ইসক্কাকে পরাজিত করে আফগানিস্তানের বাদশাহ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ জহীর শাহ এখন আফগানিস্তানের বাদশাহ।] জালালাবাদে পৌঁছানোর পরে জেনারেল নাদির খানের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে যখন কাবুলের পথে রওয়ানা হলাম তখন তিনি আমার জন্যে ঘোড়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

কাবুলে

মে মাস ছিল। একদিন অপরাহ্ণ চারটার সময় আমি কাবুলে পৌঁছে গেলাম। আমি যে কাবুলের পথে রওয়ানা হয়েছিলাম এ খবর নিশ্চয় বাদশাহ আমানুল্লার জানা ছিল। আমার কাবুলে পৌঁছানোর

পরক্ষণেই তাঁর সামনে আমায় হাজির করা হল। বেশি কিছু কথা হল না। হিজরতকারীদের ভিতরে আমিই প্রথম কাবুলে পৌঁছেছিলাম। আমার মনে হয় কি ধরনের লোক আফগানিস্তানে আসছেন তিনি তা বুঝতে চেয়েছিলেন। যাক, আমার জন্যে সব ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে তিনি হুকুম দিলেন।

সে দিনই সন্ধ্যার পরে আরও চারজন কাবুলে পৌঁছে গেলেন। সকলেই শিক্ষিত যুবক। তাদের নাম — ১। মহম্মদ আকবর খান ; তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার বাসিন্দা, পেশাওয়ার ইসলামীয়া কলেজে বি এ পড়ছিলেন। ২। গওহর রহমান খান ; হাজারা জিলার হরিপুরের নিকটবর্তী দরবেশ গ্রামের বাসিন্দা। ৩। সুলতান মাহ্‌মুদ ; হাজারা জিলার হরিপুরের বাসিন্দা। ৪। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্ ; পেশাওরর জিলার নৌ-শহ্‌রার বাসিন্দা। এই চারজন বন্ধুকেও বাদশাহের সামনে হাজির করা হয়েছিল কিনা তা আমি জানতে চাইনি। আমি ছিলাম ভোপাল রাজ্যের লোক, আর তাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের। ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লেগেছিল। শুরুর দিকে আমরা খানিকটা ষড়যন্ত্রকারীর পদ্ধতি মেনে চলতাম। কার মনে কি আছে, কে জানে?

আমাদের ক'জনের নির্বিঘ্নে কাবুলে পৌঁছানোর খবর ভারতের কাগজে ছাপা হতেই দেশ হতে দলে দলে লোক আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁদের অনেকে ডাককা পৌঁছেছেন এই খবর পেয়েই আফগান সরকার আমাদের জব্‌লুস্ সিরাজে পাঠিয়ে দিলেন, — বললেন নতুন লোকদের জন্যে জায়গা চাই। জব্‌লুস্ সিরাজ কাবুল হতে ক'মাইল দূরে তা জানিনে, তবে হেঁটে যেতে প্রায় দু'দিন লাগে। একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। কাবুলে কয়েকজন নির্বাসিত ভারতীয়দের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। তাঁরা আমাদের চা খেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। এই নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী ও আরও কয়েকজন। তাছাড়া, ছিলেন আবদুর রব পেশোয়ারী ও ত্রিমূল আচারিয়া (আচার্য)। আবদুর রব আমাদের রুশ দেশে যাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। বললেন, সেদেশে বিপ্লব হয়ে গেছে, ক্ষমতা দখল করেছে শ্রমজীবী জনগণ। আমরা সেদেশে গেলে অনেক কিছু দেখতে ও শিখতে পারব। আমরা ক'জন তো তখনই রাজি হয়ে গেলাম। সেই থেকে আমাদের ক'জনের চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কখন আমরা সেই বিপ্লবের দেশে পৌঁছাব।

হিজরতকারীদের ভিতরে নানান ধরনের লোক ছিলেন। বেশ কিছু লোক তো সত্য সত্যই ধর্মোন্মাদনার বশে গিয়েছিলেন। তাঁরা প্রচারকারীদের প্রচারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যুবকদের ভিতরে বেশিরভাগ ভেবেছিলেন ইংরেজরা যখন ওয়াদা রাখলেন না তখন তাঁরাই আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে তুর্কিতে গিয়ে তুর্কির হয়ে লড়াই করবেন। আর, অল্প সংখ্যক যুবকের চিন্তায় ছিল যে তাঁরা দেশের বাইরে চলে গিয়ে বাইরে থেকে পন্থা বার করবেন কি করে ভারতে ইংরেজের ওপরে

আঘাত হানা যায়। হিজরতকারীদের সঙ্গ নেওয়া ছিল তাঁদের পক্ষে পরম সুযোগ।

ক্রমে জব্‌লুস্ সিরাজে ১৮০জন হিজরতকারী জমায়েত হলেন। আবদুর রব আফগান সরকারের নিকট হতে অনুমতি চেয়েছিলেন যে কয়েকজন হিজরতকারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সোভিয়েত দেশে যেতে চান। সেই অনুমতি পাওয়া গেল না। অবশ্য, আবদুর রব ও তাঁর সাথীদের যাওয়ার পথে কোনও বাধা ছিল না। এদিকে জব্‌লুস্ সিরাজে আমাদের ভিতরে একটি আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সেই আলোচনা এই ধরনের। বাদশাহ্ আমানুল্লা লড়াই করার কোনও সুযোগ আমাদের দিবেন না। আমাদের আফগানিস্তানে আসার সুযোগ নিয়ে তিনি ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমন্টের ওপরে একটি চাপ সৃষ্টি করতে চান মাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য, খুব ভালো শর্তে ইংরেজের সহিত সন্ধি করে নেওয়া। ১৯১৯ সালের আফগান যুদ্ধের পরে এই সময়ে মসৌরিতে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা চলেছিল।

জব্‌লুস্ সিরাজে আমাদের ভিতরে যে এই জাতীয় আলোচনা চলেছিল সে খবর আফ্‌গান সরকার পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই, এরপরে ওখানে লোক পাঠানো সরকার বন্ধ করে দিলেন। আমরা কয়েকজন সোভিয়েত দেশে যাওয়ার জন্যে বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের সম্বন্ধে আবদুর রবের দরখাস্ত আফগান সরকার না মঞ্জুর করেছিলেন। এই কারণেই অন্যদের সঙ্গে আমরাও বাদশাহের নিকটে দরখাস্ত করলাম যে আমাদের অবিলম্বে আনাতোলিয়া (তুরস্কে) যেতে দেওয়া হোক। আমাদের দরখাস্ত নিয়ে গড়িমসি করা হচ্ছিল। তখন আমরা লিখলাম বাদশাহ্ যদি আমাদের অনুমতি না দেন তবে আমরা বিনা-অনুমতিতেই রওয়ানা হয়ে যাব। রাস্তার পাশে তোপ বসিয়ে আমাদের ভয় দেখানো হল। কিন্তু আমরা কিছুতেই বাগ মানলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা যাওয়ার অনুমতি পেলাম।

তির্‌মিজের পথে

জব্‌লুস্ সিরাজে যে আমরা ১৮০জন হিজরতকারী ছিলাম তাকে দু'টি কাফেলায় (যাত্রীদলে) ভাগ করা হল। প্রথম কাফেলায় ছিলাম আমরা ৮০জন। হাজারা জিলার মুহম্মদ আকবর খান আমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় কাফেলায় শেষ পর্যন্ত ক'জন ছিলেন তা জানিনে, তবে তার নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন পেশোয়ারের মুহম্মদ আকবর জান। তিনি লোক তেমন ভালো ছিলেন না। যাক, আমাদের কাফেলার নেতা মুহম্মদ আকবর খানের অধিনায়কত্বে আমরা ৮০জন একদিন রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে মীর আবদুল মজিদ, ফিরোজুদ্দীন মনসুর, শওকত উস্‌মানী, মস্‌উদ আলি শাহ, গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ, আবদুল কাদির সোহ্‌রাই, ফেদা আলি ও গোলাম মুহম্মদ প্রভৃতি ছিলেন। পথের একটি ঘটনার কথা এখানে বলব। মজার-ই-শরীফে পৌঁছে একদিন রাত্রে আমরা একটা

সরাইতে ছিলাম। সেই সময়ে একজন তুর্কি এসে আমাদের নিকটে প্রস্তাব করেন যে তিনিও আমাদের কাফেলার সঙ্গে যেতে চান। সেদিন আমাদের সঙ্গের সরফরাজ নাম একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার জায়গায় এই তুর্কিকেই সরফরাজ নাম দিয়ে আমরা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। তাঁকে সঙ্গে নেওয়াতে যে আমাদের উপকার হয়েছিল সে কথা পরে বলা হবে। তাঁকে আমরা আমাদের মতো পোশাকও পরিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই : তিনি এক সময়ে তুরস্কের সৈন্য ছিলেন। জারের আমলে কখন কিভাবে রুশ এলাকায় ধরা পড়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। বিপ্লবের পরে তিনি মুক্তি পান। তবে, তুরস্কে ফিরে যেতে তখন তাঁর সাহসে কুলায়নি কিংবা যাওয়ার সুযোগ পাননি। তারপরে তিনি আফগানিস্তানের মজার-ই-শরীফে এসে থাকছিলেন। তুর্কি তাঁর মাতৃভাষা। দীর্ঘকাল সাইবেরিয়ায় থাকার কারণে রুশ ভাষাও তিনি শিখেছিলেন, আর আফগানিস্তানে বাস করে পারসী ভাষাও আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

হিন্দুকুশ অতিক্রম করা কিছু সুখের পথচলা নয়। যদি প্রতিদিনের ডায়েরি লিখে রাখতাম তবে বিস্তৃতভাবে বলতে পারতাম কী দুঃখের পথ তা ছিল। তখনও স্থানে স্থানে বরফ গলেনি। ঠাণ্ডা ছিল খুবই। হিন্দুকুশের মতো পাহাড়ের পথের দুর্গমতা সহজেই অনুমেয়। এই পথেরও একদিন শেষ হল। আমরা নীচে নামলাম। আমুদরিয়া সেখানে পাহাড় হতে নেমে খুবই চওড়া হয়েছে। পার হতে পারলেই তিরমিজ—সোভিয়েত দেশের এলাকা। অনেক বালি ও কাদা ডিঙিয়ে আমরা নৌকায় নদী পার হলাম। আমাদের অনেকের জুতো হারাল, অনেকের ছিঁড়ল পরনের পায়জামা। জারের আমলে মধ্য এশিয়ার শহরগুলি দু'টি এলাকায় বিভক্ত ছিল — রুশীয় এলাকা ও দেশীয় এলাকা। তিরমিজের দুর্গ ছিল রুশীয় এলাকায়। আমরা দেশীয় এলাকার একটি সরাইতে গিয়ে উঠলাম। আমাদের পৌঁছানোর খবর পেয়ে দুর্গ হতে দু'জন এলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন অনুবাদক। রুশ ভাষার কথা আমাদের পারসিতে বোঝানো হচ্ছিল। আমাদের জন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন আমরা যেন ওখানেই থাকি, এই কথা জানিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। তার কিছু সময় পরে ব্যান্ড বাজিয়ে দুর্গ হতে লাল সৈনিক ও অফিসাররা আমাদের স্বাগত জানাতে এলেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গে করে দুর্গে নিয়ে গেলেন, ধরে নিয়েছিলেন যে আমরা ভারতীয় বিপ্লবী। যতটা মনে পড়ে সময়টা ১৯২০ সালের জুলাই মাস ছিল। হিন্দুকুশ অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের শরীরে বড় ক্লান্তি এসেছিল। তিরমিজের দুর্গে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা এই ক্লান্তি দূর করলাম। তারপরে আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি। দুর্গাধ্যক্ষ বললেন, স্টিমার আসার পরে আমরা যেন যাই। তিনি আমাদের বিপ্লবের পরের সোভিয়েত দেশ দেখার জন্যেও অনুরোধ করলেন। স্টিমার কোন্ দিন যে এসে পৌঁছুবে তা তিনি বলতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গীরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে চাইছিলেন না। তাঁদের ভিতরে বেশির ভাগই আনাতোলিয়ায় গিয়ে তুর্কির হয়ে লড়াই করার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

কির্কির পথে

তুর্কমেনিস্তানের কির্কিতে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গই যে আমাদের লক্ষ্য হবে তা আমরা জানতাম না। স্টিমার আসার তারিখ যখন আমাদের জানা নেই তখন আমরা স্থির করলাম নৌকাতেই যাব। আমরা আশিজন দু'খানা নৌকায় চড়ে আমদরিয়ার জলপথে রওয়ানা হলাম। তিরমিজ (এখন উজবেকিস্তান রিপাবলিকের এলাকা) হতে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তুর্কমেনদের এলাকা পড়ে। এই এলাকা এখন তুর্কমেনিস্তান রিপাবলিকে পরিণত হয়েছে। সেই সময়ে তুর্কমেনরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমরা যখন তাদের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তারা মাল্লাদের ডেকে নৌকা কূলে ভিড়াতে বলল। কেন তারা আমাদের নৌকা কূলে ভিড়াতে বলছে তার কারণ আমরা বুঝতে পারিনি। একথা আমাদের কল্পনায়ও আসেনি যে ব্রিটিশের অত্যাচারে দেশত্যাগী আমরা—আমাদের কোনও ক্ষতি মুসলিম তুর্কমেনরা করতে পারে। ঘুণাক্ষরেও তাদের মনের ইচ্ছা বুঝতে পারলে নৌকা আমরা আফগান এলাকায় ভিড়িয়ে দিতে পারতাম। নদীর অপর পারে তখনও আফগান এলাকা ছিল। নৌকা তুর্কমেনদের তীরে ভিড়িয়ে ডাঙ্গায় নামা মাত্রই তারা এসে আমাদের চারদিক হতে ঘিরে ফেলল। বলল, "তোমরা এখন এখানেই থাকবে, আমাদের কালান্তর এসে অনুমতি দিলে তবে যেতে পাবে।" আমরা কেউ তুর্কি ভাষা জানিনে। সরফরাজ আমাদের পারসি ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন তুর্কমেনরা কি বলল। 'কালান্তর' শব্দের মানে সর্দার। বুঝতে পারলাম আমরা বন্দি হয়েছি। সেই রাত্রি তুর্কমেনদের পাহারায় আমাদের নদীর কূলেই কাটাতে হল। ভোর হতেই দেখলাম লাঠি হাতে প্রায় এক হাজার তুর্কমেন সেখানে জড়ো হয়ে গেছে। প্রথমেই তারা আমাদের প্রত্যেকের শরীরের ও জিনিসপত্রের তল্লাসি নিল। আমাদের নিকটে কোনো হাতিয়ার নেই এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 'হাইকো' 'হাইকো' আমাদের তাড়া করা শুরু কর দিল। 'হাইকো'র মানে নাকি জলদি চল। আমরা সরফরাজের মারফতে অনেক অনুনয় করে তাদের বোঝালাম যে আমরা ভারতের মুসলমান— ইংরেজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেশত্যাগ করে এসেছি। শুনেই তারা বলল, "ইংরেজ? তারা তো ভালো মানুষ। তাদের নিকট হতেই তো আমরা সাহায্য পাচ্ছি।" আমাদের কোনো কথাই তারা শুনতে চাইল না। তারা ধরে নিয়েছিল আমরা বল্‌শেভিক। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহের চেহারা এমন যে অনায়াসে তাঁকে ইউরোপীয় বলে সন্দেহ করা যায়। তার গায়ের রং শুধু ফরসা নয়, তাঁর চোখও নীল।

তুর্কমেনরা আমাদের পশুর মতো তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের পিঠের ওপরে মারও পড়ছিল। দুপুরের সময় আমাদের আশি জনকে একটি কামরায় ঠাসাঠাসি বন্ধ করে দিয়ে তারা সকলে খেতে চলে গেল। কিছু সময় পরে ফিরে এসে আবার আমাদের মার্চ করানো শুরু করে দিল। আমাদের এইভাবে চলার সময়ে গ্রামের ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সকলেই বাড়ির বা'র হয়ে আসছিল এবং প্রত্যেকেই অন্তত কোনো কিছু দিয়ে একটি আঘাত আমাদের ওপরে হানছিল।

তাদের ধারণা ছিল যে তারা ধর্মযুদ্ধের পুণ্য হাসিল করছে। রাত হয়ে যাওয়ায় আমাদের একটি সরাইখানায় আটক করে রাখা হল। তারা বলল, আমাদের নিকটে পয়সা থাকলে আমরা রুটি কিনে খেতে পারি। গ্রামের ছেলেরা রুটি নিয়ে এসেছিল। খুব চড়া দামে তা আমাদের নিকট বেচল। ক'দিন আমরা এই সরাইখানাতেই থাকলাম। আমাদের ভিতরে অনেকে নামাজ পড়ছিলেন এবং কোরান পাঠ করছিলেন। তা দেখে তুর্কমেনরা বলতে লাগল, "দেখ দেখ, কাফেরেরা নামাজ পড়ছে আর কোরান পাঠ করছে!"

এরই মধ্যে এক দুপুর বেলা কয়েকজন মৌলবী সাহেব তাঁদের ছোকরা চেলাদের সঙ্গে নিয়ে ওখানে এলেন। তাঁদের পোশাক ভালো তো ছিলই, চেহারা দেখে মনে হল তাঁরা খানাপিনাও করেন ভালো। তাঁরা আমাদের বললেন, "আপনাদের কিছু জিনিস তো এরই মধ্যে লুট হয়ে গেছে, বাকি জিনিসগুলিও আপনারা হারাতে পারেন। ভালো হবে আপনারা যদি জিনিসগুলি আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেন।" তাঁরাই জিনিসগুলির পৃথক পৃথক তালিকা তৈয়ার করে নিলেন। আমাদের ভিতরে এমন সব বোকাও কিছু কিছু ছিলেন যাঁরা তাঁদের টাকা-কড়িও মৌলবী সাহেবদের হাতে সঁপে দিলেন। মৌলবী সাহেবরা আমাদের জিনিসগুলি উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে চলে গেলেন।

তারপরে আবার আমাদের মার্চ করানো শুরু হল। আমাদের এমন একটি খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল যার চারদিকে গাছে ঘেরা। এখানেই আমাদের বিচার আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের গুলি করে মারা হবে এই আলোচনা চলছিল। তা শুনে আমাদের তুর্কি সঙ্গী সরফরাজ কাঁদছিলেন এবং আমাদেরও তিনি বলে দিচ্ছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের ভিতরেও অনেকে কান্না জুড়ে দিল। তখন আমাদের নেতা মুহম্মদ আকবর খান চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন : "ভাইরা, তোমরা ঘাবড়িও না। কুকুরের মরণ আমরা কিছুতেই মরব না। হিন্দুকুশের দুর্বিষহ কষ্টে যখন আমরা মরিনি তখন এখানেও আমরা মরব না।" আমাদের ভিতরে কেউ কেউ একথাও ভাবছিল যে যখন আমাদের ওপরে ওরা গুলি করতে আসবে তখন আমরা প্রত্যেকেই একজন তুর্কমেনকে সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরব।

আমাদের গুলির মুখে মৃত্যুর হুকুম হয়েই গিয়েছিল এমন সময়ে ঘোড়ায় চড়ে এক বৃদ্ধ সেখানে এল। এই বৃদ্ধের ঘোড়ার রঙ সাদা ছিল, তার চুল দাড়ি সবই ছিল সাদা, এমনকি তার পোশাকও ছিল সাদা। বৃদ্ধ ঘোষণা করল।

"বন্দিদের নিকটে আফগান সরকারের কাগজপত্র পাওয়া গেছে। আমরা যদি এখন তাদের মেরে ফেলি তবে আফগান সরকার আমাদের ওপরে হামলা করতে পারে। আর, এদিকে লাল ফৌজ তো আক্রমণ করবেই। ভালো হবে এই লোকগুলিকে এখন বন্দি করে রাখা।" তুর্কমেনরা এই নির্দেশ মেনে নিল। আমাদের তখন ছোট ছোট দলে ভাগ করা হল। এই জন্যে যে আমাদের

বিভিন্ন তাঁবুতে বন্দি করে রাখা হবে। এটা কির্কির দুর্গের কাছাকাছি একটি স্থান ছিল। এই দুর্গের এক দিকে আমুদরিয়া আর এর তিনদিকে দূরে দূরে তুর্কমেনরা তাঁবু ফেলে থাকত। তারও কিছু দূরে ছিল তুর্কমেনদের গ্রাম। এই সকল তাঁবু ও গ্রাম হতে দুর্গ আক্রমণ করার চেষ্টা তখন চলছিল। প্রত্যেক তাঁবুতে গ্রাম হতে খাবার আসত আমাদের এইসব তাঁবুতে রাখা হল। তাঁবুওয়ালারা রাত্রে বাইরে শুতে যেত। একটি তাঁবুতে আমরা চারজন ছিলাম। রাত্রে শুয়ে পড়লে আমাদের প্রত্যেকের দুখানা পা তাঁবুর কিনারা দিয়ে বাইরে গলিয়ে দিতে হত। তখন তুর্কমেনরা পা দুখানা এমনভাবে বেঁধে দিত যে পাগুলি চেষ্টা করলেও ভিতরে নিয়ে আসা যেত না। আমাদের এই বন্দিদশায় তুর্কমেনরা তাদের খাওয়া হতে আমাদের ভাগ দিত। প্রায় এক সপ্তাহ আমাদের এইভাবে কেটে যায়।

আর তিন জনের সঙ্গে যে তাঁবুতে আমি ছিলাম তা থেকে ২০/২৫ গজ দূরে কাঁচা রাস্তা ছিল। একদিন রাত্রি আন্দাজ দু'টার সময় সেই রাস্তা হতে আমরা নানা রকম পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম। চাঁদনি রাত ছিল। আমরা মাথা উঁচু করে তাঁবুর ফুটোর ভিতর দিয়ে দেখলাম বহু লোক জিনিসপত্র ও জন্তু-জানোয়ার নিয়ে পালাচ্ছে। আরও দেখলাম আমাদের ৭/৮ জন সাথীকেও তারা তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। পা-বাঁধা অবস্থায় আমাদের নড়চড় করার কোনো উপায় ছিল না। তাই, আমরা নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকলাম। সকাল হওয়ার পরে মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাবলাম আমাদের পাহারাওয়ালাও পালাল নাকি। খানিকটা পরে কিন্তু সে এসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিল। বলল, "তাঁবুর ভিতরেই তোমরা বসে থাকবে। বাইরে বেরুবার চেষ্টা করলেই তোমাদের গুলি করে মারব।" কিছুক্ষণ আমরা তাঁবুর ভিতরে বসে থাকলাম। তার পরে বোঝা গেল এই লোকটিও পালিয়েছে। আমরা বের হয়ে রাস্তায় এলাম। কোথাও কেউ নেই। পরিস্কারভাবে কিছু ভাবতেও পারছিলাম না যে কোন দিকে যাই। এক রকম না ভেবেই রাত্রে যেদিকে লোকেরা গেছে সেদিকেই চললাম। বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি গাছের তলায় আমাদের ৭/৮ জন বসে আছে। আরও দেখা গেল আমাদের আরও কিছু কিছু লোক নানান দিক হতে আসছে। সব নিয়ে চল্লিশ জন ওখানে আমরা জমায়েত হলাম। ইতোমধ্যে রাত হয়ে গেছে। ওখানে শুয়েই আমরা রাত কাটালাম। নিকটে ক'টি তাঁবুও খাটানো ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। গত রাত্রে ও আগের সমস্ত দিন কিছুই পেটে পড়েনি। আমরা ৩/৪ জন গাঁয়ের দিকে গেলাম যদি কিছু খাওয়ার জিনিস পাওয়া যায়। গ্রামে ঢুকেই দেখি এক ঠেলা ভর্তি পীচ পড়ে আছে। একটি ঘরে ঢুকে দেখলাম এক কড়াই দুধ চুলোর ওপরে রয়েছে। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে ডিম ও শুকনো রুটি প্রভৃতি অনেক কিছু পাওয়া গেল। সব জিনিস বন্ধুদের নিকটে পাঠিয়ে দিলাম। আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। একটা বাড়ির দরজায় দেখা গেল একজন বৃদ্ধা, একটি যুবতী ও একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও তাদের নিকটে এগিয়ে গেলাম। আমার মাথায় কি ভাব এসেছিল জানি না। আমি বাঁ হাতে যুবকটির হাত চেপে ধরে ডান হাতে খুব কষে তার গালে এক চড়

মারলাম। ওরা তিনজনেই চেঁচিয়ে উঠল। যুবকটি ইশারা করে আমাকে একটা ঘরের দুয়ার দেখিয়ে দিল। এর মধ্যে সরফরাজ ওখানে পৌঁছে গেছেন। আমি দুয়ার খুলেই দেখলাম ঘরের অর্ধেকটায় অনেকগুলি চায়ের পেটি স্তূপীকৃত হয়ে আছে, আর অর্ধেকে রয়েছে আমাদের জিনিসগুলি — যে জিনিসগুলি মৌলবী সাহেবেরা নিয়েছেন সেগুলি তো বটেই, যেগুলি লুট হয়েছিল সেগুলিও। তবে, কিছু কিছু মাল নেই দেখা গেল। যুবকটি এগিয়ে এসে কিছু বলল। সরফরাজ বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের মালগুলি আমরা নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু চায়ের পেটিগুলি নয়। ওগুলি তার মনিবের। আমরা হাতে হাতে আমাদের মালগুলি নিয়ে নিলাম।

আমরা ঠিক করলাম রুশীয় দুর্গের দিকেই আমাদের যেতে হবে, কিন্তু কোন দিকে আছে সেই দুর্গ? সরফরাজ একটি দিক দেখিয়ে বললেন, ওই দিকেই হবে দুর্গটি। কারণ তোপের আওয়াজ ওইদিক থেকে এসেছিল। আমরা সেই দিকে চললাম। কিন্তু শত্রু ভেবে আমাদের ওপরে রুশরা যদি গুলি চালিয়ে দেন? আমরা খুঁজে খুঁজে জওয়ার বা ভুট্টার শক্ত ডাঁটা বের করলাম। তাতে সাদা কাপড় বেঁধে দিলাম। এই সাদা পতাকা উড়িয়ে একজন আগে আগে চলল, আর সকলে চলল তার পিছে পিছে। দুর্গের বাইরে কাঁটা তারের বেড়া। বেড়ার ভিতরে আছে ব্যারাক। আমরা দেখলাম কাঁটা তারের বেড়ার ভিতরে ঘোড়ার পিঠে একজন রুশ সৈন্য বসে আছেন। সরফরাজ রুশ ভাষায় আমাদের সব কথা এই সৈনিককে বললেন। আমরা হাতে যে জিনিসগুলি বয়ে নিয়েছিলাম সেইগুলি মাটিতে নামিয়ে সৈনিকটি আমাদের দু'হাত তুলে দাঁড়াতে বললেন। আমরা সকলে তাই করলাম। তারপরে আমাদের সকলকে বেড়ার ভিতরে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হল। একজন রুশ অফিসার আমাদের সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমরা সে সব কথার জবাব দিলাম। সেই সময়ে একজন আফগান ব্যবসায়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই আমাদের অনুবাদকের কাজ করলেন। আমরা পারসীতে যা বলছিলাম তিনি রুশ ভাষায় তা রুশ অফিসারকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সৈনিক ব্যারাকে আমাদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। আমাদের প্রত্যেককে বিছানাও দেওয়া হয়েছিল। লাল সৈনিকরা আমাদের সাথীদের খুঁজে খুঁজে আনলেন। তৃতীয় দিনে এসে পৌঁছুলেন মুহম্মদ আকবর খান, আমাদের কাফেলার নেতা। আমার সব মিলিয়ে ৬০জন হলাম। আর ২০ জনের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। মনে হয় তুর্কমেনেরা তাদের মেরে ফেলেছিল।

আমরা স্থির করলাম আর নৌকাতে নয়, স্টিমার আসলে তাতেই চারজও যাব। সেখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে। [চারজও এখন তুর্কমেনিস্তান রিপাবলিকের একটি বড় শহর]

একদিন আমি আমাদের ব্যারাকের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম একজন রুশ ঘোড়সওয়ার তাঁর ঘোড়ায় একজন সৈনিকের মৃতদেহ নিয়ে ছুটে আসছেন। তিনি ইশারায় জলপান করতে চাইলেন। আমি তখনই জলপাত্র নিয়ে তাঁর সামনে ধরলাম। জলপান করে তিনি দুর্গের দিকে ছুটে গেলেন। আগেই বলেছি আমাদের ব্যারাকটি ছিল দুর্গ সংলগ্ন ব্যারাক। দুর্গ হতে খুব জোরে জোরে

ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যিনি যেখানে ছিলেন মোর্চার দিকে ছুটে এলেন। ব্যারাকের অফিসার এসে আমাদের বললেন — " এখানে আপনাদের থাকা নিরাপদ নয় আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের নিরাপদে রাখা আমাদের কর্তব্য। এখনই আপনারা দুর্গের ভিতরে চলে যান। সেটা হবে আপনাদের জন্যে নিরাপদ স্থান।" আমরা ২০জন এগিয়ে এসে বললাম, "আমাদের হাতে হাতিয়ার দিন আমরাও লড়াই করব।" অফিসার খুশি হয়ে আমাদের রাইফেল দিয়ে বললেন, "আমুদরিয়ার দিকটা আপনাদের রক্ষা করতে হবে।" প্রতি ট্রেঞ্চে আমরা দু'জন করে ডিউটি দিতে লাগলাম। এইভাবে আমরা এক সপ্তাহ প্রতি-বিপ্লবীদের আক্রমণের প্রতিরোধ করলাম। এর পরে দুর্গের কমান্ডার এসে আমাদের জানালেন, "আমাদের ওপরে প্রতি বিপ্লবীদের যে আক্রমণ চলেছিল তা আমরা সফলভাবে রুখেছি। স্টিমার যোগে আমাদের নতুন সৈন্যরা এসে গেছেন। এবারে আমরা আমাদের শত্রুদের ওপরে আক্রমণ চালাব। এই আক্রমণে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলেও চলতে পারে। তবে যদি ইচ্ছা করেন আপনারাও যোগ দিতে পারেন।" শত্রুদের ওপরে আক্রমণেও আমরা তিনজন যোগ দিয়েছিলাম — শওকত ওসমানি, মস্‌উদ আলি শাহ্ ও আমি। [শওকত ওসমানি, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকাদ্দমা চলার সময়ে দুর্বলতা প্রকাশের অপরাধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে। কার্যকলাপ হতে পরে বোঝা গিয়েছে যে মস্‌উদ আলি শাহ্ ব্রিটিশের চর। কিন্তু ব্রিটিশের চররূপেই সে প্রথমে দেশত্যাগ করেছিল কিনা তা বলা কঠিন। আশ্চর্য নয় যে চরবৃত্তি নিয়েই দেশ ছেড়েছিল।]

মাত্র তিনদিনের আক্রমণের পরে তুর্কমেন প্রতি-বিপ্লবীরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে যায়।

তাসখন্দের পথে

এবারে আমাদের কির্কি ছাড়ার পালা। সৈন্য নিয়ে যে স্টিমার এসেছিল আমরা ৬০জন তাতেই চড়ে বসলাম। স্টিমার আমাদের চারজও নিয়ে গেল। লালফৌজের সৈন্যরা ব্যান্ড বাজিয়ে স্টিমার ঘাটে এসে আমাদের স্বাগত জানালেন। চারজওতে আমরা তিন দিন ছিলাম। এখানে আমাদের খুবই অতিথি-আপ্যায়ন হয়। চারজওতে থাকাকালেই আমরা নিজেদের ভিতরে পরস্পরের মনের পরিচয় পেলাম। তার আগে আমাদের নিকটে পরিস্কার হয়নি কার মনে কি আছে। চারজও একটি রেলওয়ে জংশন। এখান থেকে নানান দিকে ট্রেন যায়। আমাদের ভিতরে অর্ধেক লোক বললেন তাঁরা আনাতোলিয়া যাবেন। সোভিয়েত সরকারের তরফ হতে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। আর বাকি আমরা তাসখন্দ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়ে বসলাম। আমাদের দলে ছিল আমাদের কাফেলার নেতা ১। মুহম্মদ আকবর খান, ২। মীর আবদুল মজিদ, ৩। সুলতান মাহমুদ, ৪। ফিরোজুদ্দিন মনসুর, ৫। গওহর রহমান খান, ৬। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্, ৭। আবদুল কাদির সেহরাই, ৮। ফেদা আলী, ৯। গোলাম মুহম্মদ, ১০। জাফর, ১১। ফজল ইলাহী কুরবান, ১২।

আবদুল্লা সফদর, ১৩। আবদুল শওকত উস্‌মানি, ১৬। তাজুদ্দিন, ১৭। মসউদ আলি শাহ্‌, ১৮। মুহম্মদ হোসায়ন, ১৯। আবদুল কাইয়ুম ও ২০। রফিক আহ্‌মদ প্রভৃতি। আমরা চারজও হতে বুখারায় গেলাম। বুখারা রেলওয়ের শাখা লাইনে ছিল। বুখারায় না গিয়েও আমরা তাসখন্দে যেতে পারতাম। কোথায় কি অসুবিধা ছিল জানি না, বুখারায় আমাদের তিনদিন থাকতে হল। আমিরের অতিথিশালাতে আমরা ছিলাম। আমির তখন পালিয়েছেন। রাজভাণ্ডার হতে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ফার্‌গুল (জোব্বা) দেওয়া হয়। বুখারা হতে রওনা হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত তাসখন্দ পৌঁছাই। ইতোমধ্যে আবুদর রব পেশোয়ারি তার দলবল নিয়ে তাসখন্দে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর লোকদের সঙ্গে আমাদের কাবুলে দেখা হয়েছিল। এই লোকেরাই স্টেশন হতে 'ইন্ডিয়া হাউসে' আমাদের নিয়ে যায়। একটি বাড়ির নাম 'ইন্ডিয়া হাউস' রাখা হয়েছিল। আবদুর রব এই বাড়িতে থাকতেন। পরে বোঝা গিয়েছিল আমরা যে ওখানে পৌঁছাব সে খবর এই বাড়িতে পৌঁছেছিল। আবদুর রব আর কাউকে এই সংবাদ না দিয়ে তাঁর লোক পাঠিয়ে আমাদের রেলওয়ে স্টেশন হতে আনান।

আমরা পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায়), তাঁর স্ত্রী এভেলিন রায়, অবনী মুখার্জি ও তাঁর রুশীয় স্ত্রী এবং মুহম্মদ শফিক আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। শফিক যে কখন কিভাবে ওদেশে গিয়েছিলেন তা আমি জানতাম না। আবদুর রব আমাদের তাঁর দলে ভেড়াবার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কি যে তাঁর দল ও রাজনীতি তার কিছুই আমরা বুঝলাম না। তিনি যে বারে বারে নিজেকে বিপ্লবীদের পিতা বলছিলেন এটাই শুধু আমরা বুঝলাম। পরে এম. এন. রায়ও আমাদের সঙ্গে সুবিস্তৃত আলোচনা করলেন। ভারতে বিপ্লব কোন পথে অগ্রসর হবে এইসব কথা তিনি আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমাদের রাজনীতিক জ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল। তবুও আমরা এম. এন. রায়ের কথা সব না বুঝলেও অনেক কিছু বুঝলাম। তখনও আমরা কমিউনিস্ট পার্টি বুঝতাম না। স্থির করলাম এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে আমরা কাজ করব। পরে ত্রিমূল আচারিয়া এসেও আবদুর রবের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ভারত সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁর আসন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়েছিল। যতটা মনে পড়ে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা তাসখন্দে পৌঁছেছিলাম।

একটি কথা এখনও বলা হয়নি। আমি আগেই বলেছি আফগানিস্তানের জব্‌লুস সিরাজ হতে দু'টি কাফেলা রওনা হয়েছিল। মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে প্রথম কাফেলায় আমরা ছিলাম, আর দ্বিতীয় কাফেলা রওনা হয়েছিল পেশোয়ারের মুহম্মদ আকবর জানের নেতৃত্বে। পরে খবর পেয়েছিলাম এই কাফেলা বুখারায় পৌঁছেছিল। মুহম্মদ আকবর জানের এক ভাই বুখারায় আফগান কনসালের অফিসে কাজ করত। সম্ভবত এ কারণেই সে কাফেলাকে বুখারা নিয়ে গিয়েছিল। এই

কাফেলায় হবিব আহ্‌মদ নসিম ছিল। তার সঙ্গে মুহম্মদ আকবর জানের মনোমালিন্য হওয়ায় তাকে আকবর জান গিরেফ্‌তার করিয়ে দেয়। হবিব প্রথমে বুখারার জেলে ছিল। তার পরে তাকে তাসখন্দের জেলে পাঠানো হয়। এই খবর পাওয়ার পরে আমরা এম. এন. রায়কে তা জানাই এবং তাঁর হস্তক্ষেপে হবিব জেল থেকে মুক্তি পায়। মুহম্মদ আকবর জানের কাফেলার বেশিরভাগ লোক দেশে ফিরে গিয়েছিল। আর, যারা দেশে ফেরেনি তারা আনওয়ার পাশার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আনওয়ার প্রথমে সোভিয়েত সরকারের আশ্রয়ে মস্কোতে ছিলেন। পরে মধ্য এশিয়ায় গিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধে নিহত হন।

আমরা তাসখন্দে পৌঁছানোর ক'দিন পরে দেখা গেল যে উস্‌মানি কোথায় চলে গেছে। তারপরে একদিন এম. এন. রায় আমাকে ডেকে আন্দিজান ও ওসে যেতে বলেন। আন্দিজান সম্রাট বাবরের জন্মস্থান ছিল। আমাকে ওই সব জায়গায় পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যাওয়ার পথ বার করার চেষ্টা করা। মুন্সী ফাজিলের কোর্স পর্যন্ত আমি পারসী ভাষা পড়েছিলাম। সম্ভবত এই কারণে আমায় আন্দিজানে পাঠানো হয়। আমি আন্দিজান পৌঁছে দেখলাম শওকৎ উস্‌মানি ওখানেই আছে একই উদ্দেশ্যে। সিন্ধুর অধিবাসী কিছু সংখ্যক হিন্দু ব্যবসার উপলক্ষে স্থায়ীভাবে আন্দিজানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শওকৎ উস্‌মানি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। আন্দিজান হতে আমি ওসে যাই। ওস পার্বত্য এলাকা, তখনই বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত বলতে পারি না, হয়তো এই এলাকাকেই তখ্‌তে সুলায়মন বলা হত। ওসে আমার কাজ কিছুই হল না। তুষারপাতের ভিতর দিয়ে পথ কোথায় খুঁজে পাব? অত্যধিক শীতে ও বরফের কামড়ে আমার পা ফুলে গিয়েছিল। তাসখন্দে ফিরে এলাম এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মিলিটারি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করলাম।

মিলিটারি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি স্কুলে আমাদের রাজনীতিক শিক্ষাও দেওয়া হত। আমরা মেশিনগান চালানোর শিক্ষা পেয়েছিলাম। তোপ চালানোর শিক্ষাও আমাদের আংশিকভাবে হয়েছিল। একজন হাওয়াই জাহাজ চালানো শিখছিল। ড্রিল ইত্যাদি তো হতই।

ব্রিটিশের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের বাণিজ্যিক চুক্তির কথাবার্তা চলেছিল। তার একটি শর্ত ছিল তাসখন্দের মিলিটারি স্কুলটি তুলে দিতে হবে। ব্রিটেন চাইত না যে মধ্য এশিয়াতেই কোনো ভারতীয় থাকেন।

আমরা তাসখন্দে থাকার সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব। ইন্ডিয়া হাউসে থাকার সময় আবদুল কাদির একদিন রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিল। সেই সময়ে কি করে জানিনে, গোলা-গুলি ইত্যাদির গুদামে (Magazine-এ) আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে আবদুল কাদির পালাতে শুরু করে। তাকে পালাতে দেখে কর্মরত সৈনিক তার পায়ে গুলি করে দেয়। আবদুল কাদির পড়ে যায়। যখন দেখা গেল সে ভারতীয়দের একজন তখন তাকে হস্‌পিটালে ভর্তি করে দিয়ে ইন্ডিয়া হাউসে

খবর দেওয়া হয়। হস্‌পিটালে তাকে খুবই যত্ন করা হয়েছিল। [এই আবদুল কাদির পরে পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়েছিল। মোকদ্দমা হতে সে ছাড়া পেয়ে যায়। ছাড়া পাওয়ার পরে কিন্তু সে চুপ করে বসে থাকেনি। ভারতীয় পুলিশ ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনেক কুকর্মই সে করেছে। সে সোভিয়েত দেশ, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ লিখে লন্ডনের কাগজে ছেপেছে। এই সবের পুরস্কার স্বরূপ সে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পশতু ভাষা পড়াবার চাকরিও পেয়েছিল। সে পেশোয়ারের অধিবাসী। হিজরতকারীদের সঙ্গে দেশের বাইরে যাওয়ার আগে সে পেশোয়ারের ব্রিটিশ অফিসারদের পশ্‌তু ভাষা শিক্ষা দিত। তার পরবর্তী কার্যকলাপ হতে তার ওপরে এ সন্দেহও করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ অফিসাররাই তাকে হিজরতকারীদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাসখন্দের ম্যাগাজিনে আগুনও কি সেই-ই লাগিয়েছিল? কে জানে?]

মস্কোর ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে

যতটা মনে পড়ে ১৯২১ সালের মে মাস ছিল। তাসখন্দের মিলিটারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা মস্কো চলে গেলাম। প্রাচ্য দেশের লোকদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মস্কোতে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা তাতে ভর্তি হলাম। আমাদের শিক্ষাও আরম্ভ হল। কিছুদিনের ভিতরে আমরা অনেকেই পার্টিতে যোগ দিলাম। মস্কো যাওয়ার পরে প্রথমে শওকৎ উস্‌মানী পার্টিতে যোগ দিল। তারপরে এক সঙ্গে পার্টিতে যোগ দিল গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর সাহ ও সুলতান মাহমুদ। তারও পরে মীর আবদুল মজীদ ফিরোজুদ্দীন মনসুর ও ফিদা আলি জাহিদ পার্টিতে এল। তাদের অনুসরণ করল রফীক আহ্‌মদ ও হবিব আহ্‌মদ নসিম। তার কিছু পরে পার্টিতে এল ফজলে ইলাহী কুরবান ও আবদুল্লা সফ্‌দর। আবদুল কাদির সেহরাইয়ের নাম পার্টি সভ্য হওয়ার জন্যে গওহর রহমান খান ও মিঞা আকবর শাহ্‌ সুপারিশ করেছিল, কিন্তু শওকৎ উস্‌মানী ও মস্‌উদ আলি শাহের তীব্র বিরোধিতায় প্রথমে তাকে মেম্বার করা হল না। মস্‌উদ আলি শাহ্‌ তাসকন্দেই পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। কিছুদিন পরে অবশ্য আবদুল কাদির পার্টি মেম্বার হতে পেরেছিল। আবদুল কাইয়ুমও পার্টি সভ্য হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু তার নাম কেউ সুপারিশ করেনি।

জাকারিয়া আগে হতে পার্টি সভ্য ছিলেন। তিনিও ওই সময়ে মস্কোতে ছিলেন। ১৯১৫ সালে লাহোরে কলেজে অধ্যয়নরত ১৫জন ছাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বাইরে চলে যান। মুহম্মদ আলি ও জাকারিয়া তাঁদের ভিতরে ছিলেন। মুহম্মদ আলিও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কোনও যোগ হয়নি। শুনেছিলাম জাকারিয়া পরে ইউরোপের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। আজ তিনি কোথায়, বেঁচে আছেন কিনা, আমি

তার কিছুই জানি না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

আগে হতে কয়েকজন ভারতীয় সোভিয়েত দেশে থাকার সময়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। হিজরতকারীদের ভিতরে মস্কোর ইস্টার্ণ ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ ও শিক্ষা লাভের পরে কয়েকজন যে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল সে কথা ওপরে বলেছি। এই সকল সভ্য একত্র হয়ে ১৯২১ সালে মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন। প্রবাসেই আমরা পার্টি গঠন করলাম, কারণ আমরা বুঝেছিলাম যে তার প্রয়োজন আছে। [১৯২১ সালে ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা শুরু হয়েছিল।] আমি বাংলা ভাষা জানি না। জানতে পারলাম ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলায় একখানা পুস্তক লিখেছেন। তাতে নাকি তিনিই হিজরতকারী যুবকদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বনিয়াদ পত্তন করার জন্যে খুব কুপিত হয়েছেন। পার্টি নাকি ডক্টর দত্তের মতো পুরোনো বিপ্লবীদের নিয়েই গড়া উচিত ছিল। ডক্টর দত্তরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে থাকলে তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াই তো উচিত ছিল। তাঁরা তা করলেন না কেন? আমাদের উপস্থিতিতেই তাঁরা মস্কো গিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহার খুব মিষ্টি ছিল। তার ওপরে তিনি ভালো উর্দু জানতেন। এই জন্য আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। তখন তাঁর মত শুনে আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে মস্কো আসেননি। ডক্টর দত্ত যাই বলুন না কেন, আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেছিলাম, পার্টির সভ্যপদ আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিইনি। দুনিয়ার মজুরশ্রেণির প্রথম রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে আমরাই অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। এটা ডক্টর দত্তের মনে রাখা উচিত ছিল।

মস্কোতে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পরে তা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মুহম্মদ শফিক হয়েছিল পার্টির প্রথম সেক্রেটারি। মানবেন্দ্রনাথ রায়, শফিক ও অবনী মুখার্জিকে নিয়ে পার্টির একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়েছিল। মস্কোতে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার ফলেই রায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারলেন। তা না হলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ভিতরেই তিনি শুধু একজন নেতা হয়ে থাকতেন, ভারতের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব পেতেন না।

একদিন আমরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরে আবার আমরা দেশে ফেরার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। কারণ, দেশেই তো আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে পাঠানোর কথা স্থিরও হয়ে গেল। আমাদের বলা হল আমরা প্রত্যেকেই যেন একজন সাথী বেছে নিই। এক সঙ্গে দু'জন পাঠানোই প্রথমে ঠিক ছিল। শওকৎ ওস্‌মানী সাথী বেছে নিল মস্‌উদ আলি শাহ্‌কে, আর গওহর রহমান খানের সাথী হল মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ।

আবদুল মজিদ সাথী করে নিলো ফিরোজুদ্দীনকে, আর আমার সাথী হল হবিব আহ্‌মেদ। প্রথমে গেল শওকৎ উস্‌মানী আর মস্‌উদ আলি শাহ্‌, তারপরে গওহর রহমান খান ও মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্‌। এদের দুপক্ষই বোধ হয় ইরানের ভিতর দিয়ে পথ পেয়ে গিয়েছিল। মীর আবদুল মজিদ ও ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর ইরানের রাস্তা ধরার জন্যে আজরবাইজান পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু কোনও খোলাসা পথ না পেয়ে তাদের আবার মস্কোতে ফিরে আসতে হল।

যে-পথে আমরা এসেছিলাম সে-পথে ফেরার সুবিধা ছিল না। কিন্তু দেশে ফিরতে তো আমাদের হবেই। একটি দুরতিক্রম্য পথের কথাই তখন শুধু আমরা চিন্তা করতে পারছিলাম — পামীরের পথ। আজকার পামীর নয়, ১৯২২ সালের পামীর।

পামীরের পথে

আমরা জীবনের কঠোরতম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ১৯২২ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে একদিন আমরা মস্কো ছাড়লাম। আমরা যারা সহযাত্রী ছিলাম তাদের নাম নিচে দেওয়া হল :

১। মীর আবদুল মজিদ ২। রফিক আহ্‌মদ ৩। ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর ৪। হবিব আহ্‌মদ নসিম ৫। সুলতান মাহ্‌মুদ ৬। ফেদা আলি জাহিদ ৭। আবদুল কাদির সেহ্‌রাই ৮। সঈদ ৯। আবদুল হামিদ ১০। নিজামুদ্দিন।

ফজলে ইলাহী কুরবান ও আবদুল্লা সফদরেরও আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসেননি। সঈদ, আবদুল হামিদ ও নিজামুদ্দিন কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। আবদুল হামিদ — মাস্টার আবদুল হামিদ নামে খ্যাত ছিলেন। কারণ, তিনি কাবুলে উর্দু পড়াতেন। আমাদের সব ব্যবস্থা করার ভার সোভিয়েত দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে ছিল। প্রথমে রেলপথে এক ছুটে আমরা তাসকন্দ গেলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা পরের যাত্রাপথের খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খবর পেলেই বের হয়ে পড়ব। রুশীয় বন্ধুরা বললেন, তারা খবর পেয়েছেন মরগেলান হতে লালফৌজ পামীরের দিকে যাবেন। তাদের সঙ্গে যদি আমাদের পাঠানো যায় তবে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। যখন খবর পাওয়া গেল, অমুক তারিখে লালফৌজ রওয়ানা হবেন তখন আমাদের ট্রেন যোগে মরগেলান পাঠানো হল। একজন রুশীয় বন্ধু আমাদের পৌঁছানোর পরে সৈন্যরা ওখান হতে ট্রেনে ওসের পথে যাত্রা করলেন। আমরাও ওই ট্রেনেই গেলাম। ওসের পরে আর কোনও ট্রেন নেই। রসদ ও ভারবাহী পশু জোগাড় করার জন্যে ওখানে সৈন্যদের কয়েকদিন থাকতে হবে। মরগেলানে আমাদের মিলিটারি কমিশারের হাতে সোপার্দ করে রুশীয় কমরেড আমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়েছিলেন। লালফৌজের ভিতরে কমিউনিস্ট পার্টির পুরো সংগঠন ছিল। আসলে তাদেরই নজর ছিল আমাদের ওপরে। পশু ও রসদ

জোগাড়ের পরে আমরা ওস ছাড়লাম। শুরু হল আমাদের দুঃখের পথযাত্রা। এই পথের ডায়েরী লেখার অনুমতি আমাদের ছিল না। প্রতি ঘণ্টার ও প্রতি দিনের ডায়েরী যদি আমরা লিখে রাখতে পারতাম তবেই আজ বোঝাতে পারতাম কী ধরনের ছিল সেই পথ, আর কীভাবে আমরা তা অতিক্রম করেছিলাম। আজ সব জায়গার নামও আমি ভুলে গেছি। ওস হতে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আমাদের প্রত্যেককে পোস্তিন (চামড়ার পোশাক) দেওয়া হয়। পামীরের শীত অসহনীয়। এক জায়গায় আমরা আমুদরিয়া পার হলাম। আমুদরিয়া আমরা একবার পার হয়েছিলাম তিরমিজের কাছে। সেখানে নদী পাহাড় হতে সমতল ভূমিতে নেমেছিল। তারপরে আমুদরিয়ার জলপথে রওয়ানা হয়েই আমরা তুর্কমেনদের কবলে পড়েছিলাম। আবার হাতিয়ার হাতে নিয়ে কির্কিতে আমুদরিয়ার কিনারা আমরা রক্ষা করেছিলাম। আমুদরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল। ওস হতে রওয়ানা হওয়ার পর যে নদী আমরা পার হলাম তা ছিল পাহাড়ের ওপরের আমুদরিয়া। চওড়া কম, কিন্তু খরস্রোতা। জল ঘোড়ার পেট পর্যন্ত ছিল। নদী পার হওয়ার পরে দু'দিন আমরা কুবাসায় ছিলাম। তারপরে আবার এগুলাম। মুরগাবে পৌঁছুবার আগে পথের কষ্টে অনেক ঘোড়া মরে গেল। এত বেশি চড়াই পশুগুলি কিছুতেই চড়তে পারছিল না। আমাদের চিনির কিউব দেওয়া হয়েছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হলে আমরা তা মুখে রাখতাম। আমাদের ঘোড়া মরে গেলে লালফৌজের সৈন্যরা তাদের ঘোড়া আমাদের দিয়ে তারা পায়ে হাঁটতেন। রসদ যাচ্ছিল উটের পিঠে। রসদ খরচ হতে হতে উটের পিঠ খালি হচ্ছিল। আমরা উটের পিঠেও যেতে লাগলাম। ঘোড়াগুলি মরছিলই। শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের হেঁটেই চলতে হল। উট যখন মরতে লাগল তখন আমরা এক উটের পিঠে দু'জন করে চড়লাম। সমস্ত পশু যখন মরে গেল তখন আমরা হাঁটতে লাগলাম। অবশেষে আমরা খরোগে পৌঁছালাম। এটা ছিল সৈন্যদের যাত্রার শেষ জায়গা। খরোগের উচ্চারণ সম্ভবত হরোগ। রুশরা 'হ' কে 'খ' উচ্চারণ করেন। হরোগে আমরা আট দিন বিশ্রাম নিলাম। আবার নতুন করে আমাদের (সৈন্যদের নয়) যাত্রা শুরু হবে।

আমরা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলাম। যে পোশাক পরে এতদিন পথ চলেছি সে পোশাক আর আমাদের ব্যবহার করা চলবে না। ওখানকার স্থানীয় লোকদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের ধারণ করতে হবে। আমাদের পোশাকের বদলে স্থানীয় লোকদের পোশাক জোগাড় করে নেওয়া হল। তারা কম্বলের পায়জামা, কম্বলের কোর্তা, আর কম্বলের ফারগুল (জোব্বা) পরে। আমরাও তাই পড়লাম। প্রত্যেকটি জিনিস হাজার হাজার উকুনে ভর্তি ছিল। স্থানীয় লোকের মতো টুপিও আমরা মাথায় পড়লাম। মুশকিল হল জুতো নিয়ে। স্থানীয় লোকদের চামুস নামক জুতোও আমাদের পড়তে হল। এই জুতায় 'সোল্' নেই। পায়ের তলায় কাঁকড় পড়লে প্রাণ বের হয়ে যেতে চায়। স্থানীয় লোকেরা এই জুতো পরতে পারত। তাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা অসীম, পায়ের তলাও শক্ত।

হরোগে আমরা নিজেদের আরও ছোট দলে ভাগ করে নিলাম। এক সঙ্গে এত লোকের ওই পহে যাত্রা করা উচিত নয়। প্রথম দলে আমরা চারজন যাত্রা করলাম। (১) মীর আবদুল মজিদ, (২) ফিরোজুদ্দীন মনস্‌সুর, (৩) হব্বি আহমদ নসিম ও (৪) রফিক আহমদ।

আমরা ওখান হতে যাত্রা করে ইসকাশিম দুর্গের (হরোগের দুর্গের নাম) নীচে নেমে গেলাম। নীচে গ্রাম ছিল। রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটি বাড়িতে রাত কাটাতে চাইলাম; বাড়ির মালিক আমাদের সব ব্যবস্থা তো করে দিল, কিন্তু আমরা শুয়ে পড়ার পরে দুর্গে গিয়ে খবর দিল যে, গ্রামে গুপ্তচর এসেছে। দুর্গাধ্যক্ষ কয়েকজন সৈনিক সঙ্গে নিয়ে নিজেই ছুটে এলেন এবং এসেই আমাদের বুকের কাছে রাইফেল উঁচিয়ে ধরলেন। আমরা কথা বলতেই তিনি আমাদের চিনলেন। অনেক উপদেশও তিনি দিলেন। বললেন, "এরা লোক ভাল নয়। এদের জানতে দেওয়া উচিত নয় তোমরা কোন্‌দিকে যাচ্ছ। রাত্রেই তোমরা এখান থেকে চলে যাবে।" তারপরে তিনি দুর্গে ফিরে গিয়ে একটি বান্ডিলে বেঁধে কিছু খাবার জিনিস ও সিগারেট নিজেই এসে আমাদের দিয়ে গেলেন। আমরা সেই রাত্রেই ২ টার সময় ওই গ্রাম হতে চলে গেলাম। বহু দূরে সুলায়মান নামক এক ব্যক্তির একটি বড় বাড়ি ছিল। তাই লোকেরা ওই জায়গাটিকে 'জায়ে সুলায়মান' অর্থাৎ সুলায়মানের স্থান বলে। দিনের বেলায় দশটার সময় আমরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছালাম। তার নামে পত্র ছিল। আমরা তার হাতে পত্র দিলাম। ঘরে তখন অন্য লোকেরাও ছিল। পত্র পড়ে সুলায়মান বললেন, "হাঁ, সোগনানে সোনারের ব্যবসায় ভালো চলবে। ওখানকার লোকেরা সোনার চায়ও।" উপস্থিত লোকগুলিকে ধোঁকায় ফেলার জন্যে তিনি এই কথা বললেন। তারা চলে যাওয়ার পরে তিনি বিস্তৃতভাবে আমাদের সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা করলেন। অনেক উপদেশ তিনি আমাদের দিলেন। বললেন, "পথের ধারে দু'হাজার হতে চার হাজার ফুট নিচু খাদ থাকতে পারে। একবার তাতে পড়ে গেলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কোন দিনও আর কারুর পাত্তা পাওয়া যাবে না। এমনও হতে পারে খাদের পাশে বরফ জমে আছে এবং সেই বরফ কিঞ্চিৎ বেড়ে গেছে খাদের দিকে। তোমরা পথ চলার সময়ে পায়ের চাপে ভেঙে গেল, আর তোমরা পড়ে গেলে খাদের ভিতরে। এই রকম পথে যখন চলবে তখন হাতের লাঠি দিয়ে জোরে জোরে ঠুকে দেখবে বরফ ভেঙে যাচ্ছে কিনা।" আরও নানান কথা তিনি আমাদের বললেন। দু'দিন আমাদের তার বাড়িতে রাখলেন। এখানে আমাদের আফগান সীমানায় প্রবেশ করতে হবে। পামীর হতে ভারতের (এখন পাকিস্তানের) চিত্রল এলাকায় যেতে হলে কিছুটা আফগান এলাকা পার হতে হয়। ম্যাপে দেখলে মনে হয় ছোট্ট এক ফালি জায়গা মাত্র। কিন্তু এর দুর্গমতার কথা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সীমানা এখানে অদ্ভুত। খরস্রোতা অপ্রশস্ত আমুদরিয়ার এপারে সোভিয়েতের পামীর এলাকা, ওপারে আফগানিস্তান। পিতা হয়তো সোভিয়েত এলাকায় থাকে, আর পুত্র থাকে আফগান এলাকায়। তাদের পরস্পর কথাবার্তা চলে, এপার থেকে ওপারে জিনিসপত্র ছুঁড়েও দেওয়া যায়। সুলায়মান আমাদের টাকা বদল করে ভারতীয় টাকা

দিলেন। একজন গাইডও দিলেন সঙ্গে, তার জন্যে গাইডকে অবশ্য আমাদের চার পাউন্ড দিতে হয়েছিল।

ভারতের পথে

একদিন গভীর রাতে উটের পিঠে চড়ে আমরা নদী পার হয়ে আফগান সীমানায় প্রবেশ করলাম। শেষবারের মতো আমুদরিয়া পার হলাম। এবার আমাদের দুঃখের সাধনা শুরু হল। হিন্দুকুশ আমরা অতিক্রম করেছিলাম, অতি উচ্চ পামীরও আমরা অতিক্রম করে এসেছি, কিন্তু এখানকার দুর্গমতার নিকটে সবকিছু ম্লান হয়ে যায়। আমরা গাইডকে অনুসরণ করতাম, কিন্তু সে আমাদের কাছাকাছি না থেকে অনেক দূরে দূরে থাকত। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আমাদের কোনও সুযোগ হত না। আফগান সীমানায় প্রবেশ করেই আমাদের খাড়া পাহাড়ে চড়তে হল। তার চূড়ায় ছিল স্থায়ী বরফ। তাতে না ছিল গাছ, না ছিল ঘাস। চামুস জুতো কি কষ্ট যে দিচ্ছিল তা কেমন করে বোঝাব! নীচের দিকে আফগানদের দুর্গ ছিল। আমরা পাহাড়ে চড়ার সময়ে কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। দুর্গের সৈন্যরা ভাবল নিশ্চয়ই কিছু লোক যাচ্ছে। তারা দুর্গ হতে আলো হাতে বের হয়ে পড়ল। আমরা একটা বড় পাথরের তলায় একটি গুম্ফামতো পেয়ে গেলাম এবং তার ভিতরে ঢুকে নির্জীবের মতো পড়ে থাকলাম। "ওদের বাপেরা পুড়ে মরুক, কোথায় গেল লোকগুলি" একথা বলতে বলতে সৈন্যরা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। "বাপ পুরে মরুক" আফগানদের একটা গাল। এইভাবে আমরা পথ চলতে লাগলাম। তুষারপাত শুরু হয়েছিল। তুষারের হাত হতে বাঁচার জন্যে পরের রাত্রিও আর এক গুম্ফায় আমরা কাটালাম। অবিশ্রাম তুষারপাতের জন্যে যখন আর চলতে পারছিলাম না তখন কম্বলের চার কোণে লাঠি বেঁধে সেই কম্বলের তলায় বসে থেকেছি। কম্বল খুব ভারী হয়ে উঠলে তুষার ঝেড়ে ফেলেছি। এমনও ঘটেছে যে খাড়া পাহাড় হতে নামার কোনও পথ না পেয়ে জিনিসপত্রগুলি মাথায় বেধে পাহাড়ের গায়ে পিঠ লাগিয়ে নিজেদের নীচের দিকে ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম গুম্ফায় রাত কাটানোর পরে হবিব আহমদ বলে বসল, "আমি আর কিছুতেই চলতে পারব না। আমায় এখানে ফেলেই তোমরা এগিয়ে যাও। আমার যা হবার তা হোক।" মজিদ আর আমি তার বোঝা নিয়ে নিলাম। বললাম, "তোমায় চলতেই হবে।" আরও কিছু পথ চলার পরে মনসুরও জবাব দিয়ে বসল যে, সে আর এগুতে পারবে না। তখন তার বোঝাও আমরা দু'জনে (মজিদ ও আমি) ভাগাভাগি করে নিলাম। এক জায়গায় এক খাদের পাশ দিয়ে ওপরে চড়ার সময়ে হবিব আর মনসুরের কোমড়ে দড়ি বেঁধে আমরা দু'জন তাদের দু'জনকে টেনে রাখলাম পাছে না ভারসাম্য হারিয়ে তারা খাদের ভিতরে পড়ে যায়। বাস্তবিকে মনসুর আর হবিবের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বরফের ওপর দিয়ে পথ চলার ফলে তাদের পা ফুলেছিল, পায়ের নখগুলি খসে পড়ে গিয়েছিল এবং রক্ত পড়ছিল তাদের পা থেকে। সত্যিই

তাদের পক্ষে পথ চলা অসহ্য বেদনায়ক হয়ে উঠেছিল।

আফগান সীমানায় তিনদিন পথ চলার পরে এক সন্ধ্যায় আমরা চিত্রল রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করলাম। এই সীমানার নিকটে কোথাও মানুষের বসতি ছিল না। আমাদের রসদও ফুরিয়ে গিয়েছিল। না খেয়েই আমরা একটি গুফার ভিতর রাত কাটালাম।

সুলায়মানের দেওয়া গাইডের দূর থেকে নজর তো আমাদের ওপর ছিল। সকালবেলা সে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করল। তার নিকটে কিছু রসদ ছিল। আমরা একটি ছোট্ট নদী পার হলাম। হবিব আহমদ ও ফিরোজুদ্দীনকে কাঁধে বসিয়ে পার করতে হয়েছিল। নদী পার হয়ে আমরা কিছু খড়কুটো ও লাকড়ির টুকরো কুড়ালাম। একখানা পাথরের তলায় এই সব দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। গাইড তার আটা ভিজিয়ে মেখে নিল। তার পরে রুটি তৈয়ার করে গরম পাথরের ওপরে সেঁকা হল। আমরা পাঁচজনে একত্রে বসে পরম তৃপ্তির সহিত এই রুটি খেলাম তারপরে গাইড আমাদের নিকট হতে বিদায় নিল। যাওয়ার সময়ে সে এমন ভাব দেখিয়ে চলে গেল যেন আমরা কোনদিনই তাকে চিনতাম না। আমরা গাইডের নাম জিজ্ঞাসা করিনি, সেও আমাদের নাম জানতে চায়নি। আমাদের যে ব্যাপার ছিল সে ব্যাপারে এই রকম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

চিত্রল ভারতবর্ষের ভিতরে কেটি দেশীয় রাজ্য ছিল। রাজ্যের নামও চিত্রল। এই রাজ্যের শাসককে বলা হত মেহ্তর। পাকিস্তান হওয়ার পরেও বোধ হয় এই একই অবস্থা সেখানে আছে। গাইড চলে যাওয়ার পরে আমরা পদযাত্রা শুরু করলাম। সন্ধ্যার সময়ে একটি গ্রাম পেলাম। পয়সা দিয়ে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা ও রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করা হল। কমপক্ষে মনসুর ও হাবিবের জন্যে ঘোড়া বা খচ্চর ভাড়া করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। সকাল বেলা আবার আমরা চারজন হেঁটেই রওয়ানা হলাম। বেলা হতে একটি গ্রামে পয়সা দিয়ে খেতে চাইলাম। যে লোকটিকে খাওয়ার কথা বললাম সে জানতে চাইল আমরা 'আশ' খাব কি না। আমরা খুশি হয়ে রাজি হলাম। বুখারায় দেখেছি একরকম পলাওকে 'আশ' বলে। কিন্তু খাওয়ার সময় দেখলাম আটা জলে সিদ্ধ করে তাতে নুন মিশিয়ে আমাদের খেতে দিয়েছে। কি আর করা যায়। সন্ধ্যার সময় যে জায়গায় আমরা পৌঁছুলাম সেটা ছিল আগা খানের শিষ্যদের একটি আস্তানা। আগা খানের এক খলিফা (প্রতিনিধি) ওখানে থাকেন। একটি ফ্রি লঙ্গরখানাও ওখানে চালু আছে। যে-ই আসুক তাকে দু'খানা চাপাতি ও কিছু মাসকলাইয়ের ডাল খেতে দেওয়া হয়। তাই খেয়ে ওখানকার অতিথিশালায় আমরা দু'দিন থাকলাম। ফিরোজুদ্দিন মনসুর আর হবিব আহমদকে নিয়ে আর চলতে পারা যাচ্ছিল না। তাদের পা থেকে রক্ত পড়ছিল। এখানে দু'দিন থাকার পরে আবার আমরা রওয়ানা হলাম। এবার ওদের দু'জনার জন্যে ঘোড়া ভাড়ায় পাওয়া গেল। চিত্রল শহরে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হতে চলেছে। লোকেরা মনে করল আমরা ফকীর। কেউ কেউ ডেকে ভিক্ষাও দিলেন।

মজিদ আর আমি দোকান থেকে জুতো কিনে পরলাম। মনসুর আর হবিবের জুতো পরার উপায় ছিল না। তার পরে দোকান থেকে কাপড় কিনে আমরা এক দরজিকে আমাদের জন্যে সাধারণ পাঞ্জাবী পোশাক তৈয়ার করতে দিলাম। কথা হল ভোর হওয়ার আগেই তারা পোশাক তৈয়ার করে আমাদের দেবে। এই পোশাক পরে আমরা দশজনের সঙ্গে মিশে যাব এবং যে কোনো দিকে চলে যাব, এই ছিল আমাদের মনের ইচ্ছা। রাত্রে হোটেলে কবাব-রুটি খেলাম, আর থাকলাম এক সরাইখানায়।

একটি কথা বলা হয়নি। চিত্রল রাজ্যে প্রবেশ করার পরে যখন আমরা চিত্রল শহরের দিকে এগুচ্ছিলাম তখন পথে একদল যাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তারা কোথায় যাচ্ছেন জানতে চাইলে বললেন, তারা হজ করতে যাচ্ছেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হল এদিকে কোথায় তারা হজ করবেন জওয়াব পাওয়া গেল, "মজার-ই-শরিফে"। (আমরা মজার-ই-শরিফ হয়েই তিরমজে গিয়েছিলাম। জায়গাটা তীর্থস্থান বটে।) বুঝে নিলাম ওখান থেকে 'মজার-ই-শরিফ' যাওয়ার পথ আছে এবং দরকার পড়লে আমরাও এই কথা বলতে পারব।

আমরা যা ভেবেছিলাম তা কাজে পরিণত হল না। কি করে জানি না, শহরের কোতোয়াল আমাদের আসার খবর পেয়ে গেল। মনে হয় আমাদের ব্যস্ততা দেখে পাঞ্জাবী দর্জিটা খবর দিয়ে থাকবে। তা না হলে ফকিরের পোশাক পরা লোকেদের খবরের জন্যে কোতায়াল ব্যস্ত হয় না। অতি ভোরে কোতোয়াল এসে জানিয়ে গেল যে আমরা যেন সরাইখানা ছেড়ে কোথাও না যাই। কিছু বেলা হতে আমাদের মেহ্তরের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকটে হাজির করা হল। আমরা মজার-ই-শরিফ হতে তীর্থ দর্শন করে আসার কথা বললাম। এই কথাই প্রাইভেট সেক্রেটারি মেহ্তরের নিকটে রিপোর্ট করলেন। মেহ্তর হুকুম দিলেন, প্রত্যেককে একটি করে খেলাত (জোর ও রাহা খরচের জন্য ৫০ টাকা দেওয়া হোক। এ পর্যন্ত সবকিছু আমাদের অনুকূলে ঘটছিল। প্রাইভেট সেক্রেটারির টেবিলে ইংরাজি খবরের কাগজ ছিল সংযম হারিয়ে হবিব আহমদ তাতে চোখ বুলিয়ে নিল। তাতেই প্রাইভেট সেক্রেটারির মনে সন্দেহের উদ্রেক হল তিনি ব্রিটিশের পলিটিক্যাল এজেন্টের নামে একখানা চিঠি লিখে একজন সিপাহীর হাতে দিলেন, আমাদের বললেন, "এর সঙ্গে গিয়ে একবার পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা করুন।" বুঝলাম আমাদের যা হবার হয়ে গেল। আমরা পোশাক বদলে ,,,, তৈয়ার করা পোশাক পরে নিলাম। তারপরে পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একজন মুসলিম ভদ্রলোক পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। তিনি বাহ্যত ভালো কথাই বললেন। আমাদের বললেন, "এখন শহরে গিয়ে থাকুন। তারপরে যেদিকে খুশি চলে যাবেন।" কিন্তু সিপাহী একজন সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমরা যে গিরেফতার হয়ে গেছি তা বুঝতে আর বাকি থাকল না।

পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা: ১৯২২-১৯২৩

চিত্রলে যার দোকান থেকে আমরা পোশাকের কাপড় কিনেছিলাম তারও নাম ছিল আকবর খান, পেশোয়ারের লোক। তার সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম যে তিনি আমাদের মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহের আত্মীয়। তিনি আমাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পলিটিক্যাল এজেন্টের ওখান থেকে ফিরে এসে আমরা তার বাড়িতেই খেলাম এবং রাত্রেও সেখানেই থাকলাম সরাইতে আর ফিরে গেলাম না। পরের দিন তার বাড়ি হতেই আমরা পেশোয়ারে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সকলের জন্যেই গাধা ভাড়া করা হল। একজন সিপাহীও সঙ্গে সঙ্গে চলল। পথে প্রত্যেক চৌকিতে সিপাহীর বদল হচ্ছিল। এইভাবে চতুর্থ দিনে আমরা দরগাহী পৌঁছলাম। এখান হতে যাত্রা শুরু হবে ট্রেনে। সিপাহী আমাদের থানায় পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে গেল। থানাদার বললেন পেশোয়ার হতে আমাদের নেওয়ার জন্যে গার্ড আসবে। ততক্ষণ আমাদের ওই থানাতেই থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তিনি কিছু করলেন না, এদিক-ওদিক বেড়াতে দিলেন, রাত্রে হাজত-ঘরে বন্ধ পর্যন্ত করলেন না। তারপরে পেশোয়ার হতে অনেক সিপাহী আসায় আমরা যাত্রা করলাম। এবারে আমাদের হাতকড়ি পরানো হল। অবশ্য ট্রেন চলার পরে হাত-কড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল। সকালবেলা আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম, আর রাত্রি ৮/৯ টার সময়ে আমরা পোশোয়ার পৌঁছালাম। পুলিশের লোকেরা প্রথমেই আমাদের একটি হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গেল। এই হোটেলকে হাজির হোটেল বলা হত। কাবুলে যাওয়ার সময়ে আমি এই হোটেলে খেয়েছিলাম। হোটেলের মালিক আমায় চিনতে পারলেন। খুব যত্নের সহিত তিনি আমাদের খাওয়ালেন। পুলিশের চোখ ও কান এড়িয়ে তিনি আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানাও নিলেন। পরে জেনেছিলাম যে প্রত্যেকের বাড়িতে তিনি আমাদের আসার ও গিরেফ্তার হওয়ার খবর লিখে দিয়েছিলেন।

রাত্রে আমাদের থানার হাজতে বন্ধ করে রাখা হল। পরের দিন সি আই ডি'র সুপারিন্টেন্ডেন্ট আবদুল আজিজের নিকটে আমাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে হাজির করা হল। প্রত্যেকের তল্লাশী নেওয়া হল। অবশ্য কারুর নিকটে কিছুই পাওয়া যায়নি। ছোট ছোট কাগজের টুকরায় আমরা ঠিকানা ইত্যাদি যা কিছু আনতে পেরেছিলাম তার সবকিছুই ট্রেনের পায়খানায় গিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আমাদের একত্রে না রেখে আবদুল আজিজ চার বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে আবদুল আজিজের বাড়িতে আমাদের আলাদা আলাদা নিয়ে গিয়ে প্রত্যেককের বিবৃতি নেওয়া হয়। সেদিনই একজন ইংরেজ পুলিশ অফিসারের নিকট আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় তিনি পুলিশের ইন্স্পেক্টর জেনারেল ছিলেন। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও আমরা সেদিন পেশ হলাম। তিনি আমাদের থানার হাজতে পৃথক পৃথক আবদ্ধ থাকার হুকুম দিলেন। কয়েকদিন আমাদের এভাবেই কাটল, কারুর খবর কেউ জানতাম না। তারপরে একদিন আমাদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখানেও আমরা দূরে দূরে কুঠরিতেই বদ্ধ থাকতাম। যেদিন আমি প্রথম জেলে গেলাম তার

পরের দিন ভোরে একজন ওয়ার্ডার এসে আমার কুঠরির দুয়ার খুলল। তার সঙ্গে দেখলাম কয়েদির পোশাকে ডাণ্ডা বেড়ি পরিহিত মুহম্মদ আকবর খান রয়েছেন। তাকে ওই অবস্থায় ওখানে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তিনি একটি পুটুলির ভিতরে কিছু তামাক, কাগজ ও চকমকি আমাকে দিয়ে বলে গেলেন— "আমি এই জেলেই আছি, ঘাবড়িও না।" কে জানত আমাদের কাফেলার নেতা মুহম্মদ আকবর খানকে জেলেও আমাদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে।

কিভাবে তাকে জেলে আসতে হয়েছিল সে কথা পরে বলব। যতদিন আমি কুঠরিতে আবদ্ধ থেকেছি ততদিন কেউ না কেউ পেছনের ভেন্টিলেটরের ভিতর দিয়ে আমায় তামাক ছুঁড়ে মেরেছে। অন্য বন্ধুদের বেলায়ও তাই ঘটেছে। মুহম্মদ আকবর খানের ব্যবস্থা। দু'মাস আমরা আঁধার কুঠরিতে কাটালাম। ইতোমধ্যে পেছনের লোকেরা পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের গিরেফতারের পরে তাদের গিরেফতার করা সহজ ছিল। ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের (ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২১-এ ধারা অনুসারে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হতে যাচ্ছিল। রাজ-সম্রাটকে (King Emperor) ভারতের আধিপত্য (Sovereignty) হতে বঞ্চিত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করা ছিল আইনের এই ধারার অপরাধ। এই ধারায় ও আরও কয়েকটি ধারায় কারুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে হলে প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে আগে মঞ্জুরি নিতে হত। মোকদ্দমার বিচার দায়রা আদালতে হতেই হবে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ অনুসন্ধান করা। আমাদের মোকদ্দমায় পেছনের লোকদের এসে পৌঁছানোর যেমন দরকার ছিল তেমনই দরকার ছিল মোকদ্দমা রুজু করার জন্যে সরকারের মঞ্জুরি গ্রহণ করা। এই দু'টি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে যেদিন আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করানো হল সেদিন আমরা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করলাম যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধার জন্য জেলে আমাদের এক সঙ্গে সঙ্গে রাখা হোক। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে হুকুম পাস করলেন। সেদিন থেকে জেলে আমাদের একত্রে রাখার ব্যবস্থা করা হল। এর তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই। তবে যতটা মনে পড়ে তা ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু ছিল।

যাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হল

১। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ (নৌশহরা, পেশোয়ারের অধিবাসী), ২। গওহর রহমান খান (হাজরা জিলার হরিপুরের সংলগ্ন দরবেশ গ্রামের অধিবাসী), ৩। মীর আবদুল মজিদ (লাহোর শহরের বাসিন্দা), ৪। ফিরোজুদ্দিন মন্‌সুর (শেখুপুরা শহরের বাসিন্দা) ৫। হবিব আহমদ নসিম (যুক্ত প্রদেশের শাহ্‌জাহানপুরের বাসিন্দা), ৬। রফিক আহ্‌মদ (ভোপাল রাজ্যের ভোপাল শহরের বাসিন্দা, ৭। সুলতান মাহ্‌মুদ (হরিপুর, হাজারা), ৮। আবদুল কাদির সেহ্‌রাই (পেশোয়ার), ৯। ফিদা আলি জাহিদ (পেশোয়ার), ১০। গোলাম মুহম্মদ (হেজারা জিলা)

প্রথম হতে নবম নম্বরের অভিযুক্তরা ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিল। দশম

নম্বরের অভিযুক্ত গোলাম মুহম্মদ বহু পূর্বে তাসকন্দ হাত দেশে ফিরে এসেছিল। সে কখনও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার ক'দিন পরে তার নাম আসামীর তালিকায় যোগ করা হয়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল তাকে রাজসাক্ষী করা। কমিউনিস্টদের ভিতর হতে ফিদা আলি জাহিদ রাজসাক্ষী হয়েছিল।

মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্ ও গওহর রহমন খান ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে স্বাধীন উপজাতিদের এলাকায় চলে গিয়েছিল। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যখানে স্বাধীন উপজাতিদের বসতি ছিল। তারা না ছিল আফগানিস্তানের প্রজা, না ছিল ভারতের। আমরা গিরেফ্‌তার হওয়ার পরে গওহর রওমান ও আকবর শাহ্ দেশে ফিরে এসে গিরেফ্‌তার হয়।

হ্যাঁ, সেই যে হোটেলের মালিক আমাদের বাড়ির ঠিকানা নিয়েছিলেন সেই অনুসারে সব জায়গায় তিনি পত্রও লিখেছিলেন। বেশির ভাগ লোকের বাড়ি হতে আত্মীয়রা এসেও গিয়েছিলেন। পেশোয়ার আর হাজারার অভিযুক্তদের আত্মীয়রা তো অমনিতেই খবর পেয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করিনি। ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা সরকার পক্ষ কায়দা-কানুনের খেলাফ কিছু করেছেন কিনা তার ওপরে নজর রাখার জন্যে একজন উকিল মাত্র নিযুক্ত করা হয়েছিল।

গোলাম মুহম্মদকে আসলে রাজসাক্ষী করার জন্যে মোকদ্দমায় শামিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকার সুবিধার জন্যে সম্ভবত সে নীচের আদালতে আমাদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। সাক্ষ্য পক্ষেই দিক, আর বিপক্ষেই দিক, একজন আসামী যখন সাক্ষ্য দিচ্ছিল তখন তাকে সঙ্গে রাখা আমাদের উচিত হয়নি। সেশন আদালতে মোকদ্দমা যখন শুরু হল তখন তাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেশন কোর্টে সে চুটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ফিদা আলি জাহিদ গোড়া থেকেই আলাদা ছিল। নীচের আদালতে সাক্ষ্য সে আমাদের বিরুদ্ধে দিয়েছিল। কিন্তু দায়রার আদালতে গিয়ে সে তার নীচের আদালতের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে। সরকার পক্ষের কি চাল এটা ছিল তা জানি না, তবে এরা দু'জনেই রাজসাক্ষী হিসাবে ক্ষমা ও ছাড়া পেয়েছিল।

সেশন কোর্টে মোকদ্দমার তদবির ভালোই হয়েছিল। আমাদের কোনো কোনো বন্ধুর বাড়ির লোকেরা টাকা খরচ করেছিলেন। বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক ও আইনজীবী (পরে লাহোর হাইকোর্টের জজ) স্যার আবদুল কাদির আমাদের পক্ষে এসেছিলেন। শুনেছিলাম তিনি ফিস কম নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর মতো আইনজীবী আমাদের পক্ষে থাকার জন্যে আমাদের সাজা কম হয়েছিল। সেশন কোর্টে দু'জন এসেসর ছিলেন। তাঁরা আমাদের নিরাপরাধ বলেছিলেন। তবে, এসেসরদের কথা জজ মানতে বাধ্য নন।

১৯২৩ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (দুর্ভাগ্য যে তারিখ মনে নেই) জজ মোকদ্দমার রায় শোনালেন।

রাজসাক্ষী দু'জন তো ছাড়া পেলই, আর ছাড়া পেল পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের ঘোর শত্রু

আবদুল কাদির সেহ্‌রাই।

যারা দণ্ডিত হয়েছিল ১। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্ ও ২। গওহর রহমান খান, প্রত্যেকের দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ৩। মীর আবদুল মজিদ, ৪। ফিরোজুদ্দিন মনস্, ৫। রফিক আহ্‌মদ, ৬। হবিব আহ্‌মদ নসিম ও ৭। সুলতান মাহ্‌মুদ, এই পাঁচজনের প্রত্যেকের এক বছরের সহ কারাদণ্ড।

এইভাবে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি ঘটল। আমরা আমাদের সাজার বিরুদ্ধে আপিল করিনি। ১৯২৩ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কানপুরে শওকৎ উস্‌মানী, কলকাতার মুজফ্‌ফর আহমদ ও লাহোরে গোলাম হোসায়ন গিরেফ্‌তার হন। ভারত গবর্নমেন্ট তাঁদেরও পেশোয়ারের মোকদ্দমায় শামিল করতে চেয়েছিল। শওকৎ উস্‌মানী আর গোলাম হোসায়নকে তো পেশোয়ার জেলে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা তখন শেষ হয়। বোধ হয় সেই জন্যেই এই তিনজনকে ওই মোকদ্দমায় আসামী না করে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দি করা হয়। অবশ্য পরের বছরের মার্চমাসে তিনজনকেই কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ক্ষমা চেয়ে গোলাম হোসায়ন ছাড়া পেয়ে যায়। (কানপুর মোকদ্দমায় শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে আর নলিনী গুপ্তেরও বিচার হয়েছিল।)

এখন আমাদের ওপরে ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলি। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমার অনুসন্ধান আরম্ভ হওয়ার আগে আমাদের বেড়ি পরানো হয়নি। যেদিন এই কোর্টে অনুসন্ধান শুরু হল সেদিনই আমাদের বেড়ি পরিয়ে দেয়া হল। সেশন কোর্টে রায় শোনানোর দিন পর্যন্ত এই বেড়ি আর খোলা হয়নি। সাজা হওয়ার দিন আমাদের বেড়ি খুলে দেওয়া হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাদের তিন বছরের সাজা হত তাদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হত। তার কম সাজা হলে বেড়ি পরানো হত না। কয়েদি হিসাবে কোনও বিশেষ ব্যবহার আমরা পাইনি। সাধারণ মামুলি কয়েদি ব্যবহার আমরা পেয়েছি। আমাদের সাজার দিনগুলি পেশোয়ার সেন্ট্রাল জেলে কেটেছে। একটি কথা বলা দরকার। ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চলেছিল। এই প্রদেশটি ব্রিটিশ আমলে একটি নিষিদ্ধ স্থান ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই জন্যে আমাদের মোকদ্দমার খবর বিশ্বময় তো দূরের কথা, ভারতময়ও প্রচারিত হয়নি।

মুহম্মদ আকবর খানের কথা আমি বারে বারে বলেছি। তাসকন্দ পর্যন্ত আমরা একত্রে গিয়েছি। সেখানে তিনি বেশি দিন থাকেননি, যদিও তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিটারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতেও তিনি যোগ দেননি। ইংরেজের কবল হতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। ধর্মোন্মাদনার বশে কিংবা আনাতোলিয়া গিয়ে তুর্কির হয়ে লড়াই করার জন্যে তিনি ভারত ছাড়েননি। পার্টির নির্দেশে তিনি গোপনে দেশে ফিরেছিলেন। স্বাধীন উপজাতির এলাকায় একটি প্রেস বসিয়ে তা থেকে ইশ্‌তেহার ছাপানো ও বিতরণের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর

কাজ। প্রেস কিনে তিনি স্বাধীন এলাকায় পাঠাতেও পেরেছিলেন। প্রেসের কিছু জিনিস পাঠাতে বাকি ছিল। এই বাকি জিনিসগুলি পাঠানোর আগে তিনি খবর পান যে তাঁর দেশে ফেরার খবর পুলিশ পেয়ে গেছে। বন্ধুরা উপদেশ দিলেন, আপাতত তাঁর স্বাধীন উপজাতীয় এলাকায় গিয়ে কিছুদিন থাকা উচিত। তাই তিনি ডাক্তারের বেশে উপজাতির এলাকায় যাচ্ছিলেন, সীমানায় ধরা পড়ে যান। তাঁর নামেও ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ -এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চলে। সেশন আদালত তাঁকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জেল হতে গোপন পথে তিনি তাঁর একজন সহকর্মীকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। সহকর্মীটি নিরাপদে এই পত্র পেয়েও গিয়েছিলেন। পত্রে উপদেশ ছিল যে প্রেসের বাকি জিনিসগুলি যেন স্বাধীন উপজাতীয় এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় উপদেশ ছিল তিনি যে ধরা পড়েছেন সে-খবর যেন সোনালী দাঁতওয়ালাকে পাঠানো হয়। মুহম্মদ আকবর খানের সহকর্মী প্রেসের বাকি জিনিস নিয়ে যখন সীমানা পার হতে যাচ্ছিলেন তখন ধরা পড়েন। তারপর তাঁর বাড়ি তলাশি হয়। সেখানে মুহম্মদ আকবর খানের গোপন পথে পাঠানো পত্রখানা পুলিশ পেয়ে যায়। এই বোকা সহকর্মীটি সযত্নে আকবর খানের পত্র বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। এই পত্র পাওয়ার পরে মুহম্মদ আকবর খানের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চলে। তাঁর সহকর্মীটিও তাতে অভিযুক্ত হন। পুলিশের মতে সোনালী দাঁতওয়ালা মুহম্মদ আলি ছাড়া আর কেউ নন। মুহম্মদ আলির কথা আমি আগে বলেছি। দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুহম্মদ আকবর খানের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, আর তাঁর সহকর্মীর হয়েছিল ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মুহম্মদ আকবর খানের দু'টি সাজা পরে পরে চলেছে। জেল হতে গোপন পথে পাঠানো একখানা পত্রের জন্যে যে কারুর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চলতে পারে এটা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সত্যই তা ঘটেছিল।

আনাতোলিয়ায় যাঁরা গিয়েছিলেন শুনেছি তাঁদের যুদ্ধ করতে হয়নি। তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিল কারাগার। অন্তত কিছুদিন তাঁরা কারাবন্দি ছিলেন। তাঁদের আনাতোলিয়া যাওয়ার আগে মুস্তফা নামে একজন ভারতীয় গুপ্তচর ওই দেশে ধরা পড়ে। এই লোকটি মুস্তফা সগীর নামে কুখ্যাত হয়েছিল। 'সগীর' মানে ছোট। অর্থাৎ, মুস্তাফা কামাল ছিলেন বড় মুস্তফা। শুনেছি কিছুকাল পরে এই ভারতীয়দের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা দেশে ফিরে আসতেও পেরেছিল। আশাকরি শেষ পর্যন্ত তাদের জ্ঞানোদয় হয়েছিল। এই লোকগুলির মধ্য হতেই কেউ কেউ তুর্কমেনদের হাতে মার খেয়েও তুর্কমেন মৌলবাদীদের হাতে তাদের টাকা তুলে দিয়েছিল। আবার তুর্কমেনদের নিকট হতে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে বেঁচে যাওয়ার পরেও এরাই কির্কিতে তুর্কমেনরা মুসলিম ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল না। এসব বুঝেও লালফৌজরা তাদের কত আদরযত্ন ও সাহায্য করেছিলেন।

(পরিচয় । ৩০ বর্ষ ।। ২য় - ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৭, ১৮৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনীর ভূমিকা: 'অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী' লেখাটির নাম প্রথম নজরে আসে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত 'মুজফ্ফর আহ্মদ -এর নির্বাচিত রচনা সংকলন (সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) এর কালানুক্রমিক গ্রন্থ পঞ্জীতে (শারদীয় পরিচয় ৩০ বর্ষ, সংখ্যা ২-৩ ১৩৬৭)। শুরু হয় পরিচয়ের উক্ত সংখ্যাটি খোঁজা। অবশেষে ভবানী সেন পাঠাগারে পরিচয়ের বিপুল সংগ্রহে উক্ত সংখ্যাটি পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারিক অরুণ ঘোষের সক্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইভাবেই আরো বেশকিছু লেখা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের এখনও আমাদের প্রজন্মের কাছে অপঠিত। আশাকরি আগামীদিন পাঠকের সহযোগীর সে সব লেখাও উদ্ধার করে প্রকাশ করা যাবে। 'অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী'র শেষে অগ্রন্থিত লেখা পত্রের একটা তালিকা দেওয়া হল। উক্ত পত্রিকাগুলির সন্ধান দিতে পারলে বাধিত থাকব।

(কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের অগ্রন্থিত লেখা পত্রের এই দীর্ঘ তালিকা পাঠকের কাছে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য — ভবিষ্যৎ এই বিলুপ্তপ্রায় লেখাগুলিকে সংকলিত করে প্রকাশ করা। আমরা আশাকরি আমাদের সঙ্গে পাঠকরাও এইসব পত্রিকা ও প্রকাশনার সন্ধান করবেন। আমাদের এই তালিকার বাইরে আরো লেখা পত্র থাকতেই পারে। সেগুলিরও অনুসন্ধান একান্ত জরুরি। পত্রিকার সন্ধান (ব্যক্তিগত বা কোন পাঠাগারে আছে) দিলে আমরা যোগাযোগ করে লেখা সংগ্রহ করে নেব। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের মননের জগৎকে আরো গভীরভাবে আমরা চিনে নিতে পারব।)

অগ্রন্থিত বাংলা লেখা

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

ইমন-আল-গজ্জালী। বর্ষ ১ সং ২ ১৩২৫ বঙ্গদেশে মাদ্রাসার শিক্ষা। বর্ষ ২ সং ৩ ১৩২৬ আরব ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। (দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে লেখা) বর্ষ - ২ সংখ্যা - ৪ ১৩২৬

ইব্নে তুফায়্ল। বর্ষ ২ সংখ্যা - ৪ ১৩২৬ চিঠি (সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর "নারীর মূল্য" চিঠির উত্তরে) বর্ষ -২ সংখ্যা ৪ ১৩২৩

'বুইয়র' এর যুদ্ধ। (দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে) বর্ষ ২ সংখ্যা ৪, ১৩২৬

সমিতি সংবাদ। বর্ষ - ২ সংখ্যা - ৩ । ১৩২৬ আলোচনা (সংকলন) বর্ষ - ৩ সংখ্যা ১। ১৩২৭ ডাক্তার হোসায়ন (সংকলন) বর্ষ ৩ সংখ্যা ১।১৩২৭ "নারীর মূল্য ও ইসলাম" এর জের (আলোচনা)। বর্ষ - ৩ সংখ্যা - ১।১৩২৭

লাঙল

ভারত কেন স্বাধীন নয়? বর্ষ ১ সংখ্যা ৪ ৩০ পৌষ ১৩৩২ কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। বর্ষ ১

সংখ্যা ৫ মাঘ ১৩৩২ কোথায় প্রতিকার? বর্ষ - ১ সংখ্যা ৬ ১৪ মাঘ ১৩৩২ কারাগার সম্পর্কে দেশের ঔদাসীন্য বর্ষ - ১ সংখ্যা - ১৩ ১১ চৈত্র ১৩৩২

ধুমকেতু

দ্বৈপায়নের পত্র	বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩	২৮ আশ্বিন ১৩২৯
ঐ	বর্ষ ১ সংখ্যা ১৬	৭ কার্তিক ১৩২৯
ঐ	বর্ষ ১ সংখ্যা ১৮	১৪ কার্তিক ১৩২৯
গান্ধী চরিত	বর্ষ ১ সংখ্যা ১৯	১৭ কার্তিক ১৩২৯।

স্বাধীনতা

পহেলা মে ১৮ বৈশাখ ১৩৬৭ (১ মে ১৯৬০) জাপান ভারতের বন্ধু নহে শারদীয় ১৩৬৯
একখানি পত্র ৬ নভেম্বর ১৯৬৮ (১৩৭৫)

নন্দন

১। কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম। বর্ষ ২ সংখ্যা ২ ১৩৭১।
২। একখানি পত্র বর্ষ-২ সংখ্যা ১১ ১৩৭১
৩। সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ বর্ষ ৩ সংখ্যা ২, ১৩৭২
৪। রুশ বিপ্লব, লাল ফৌজ ও কাজী নজরুল ইসলাম বর্ষ। সংখ্যা ২ ১৩৭৩।
৫। আমি একজন কমিউনিস্ট বর্ষ ৬ সংখ্যা ১২ ১৩৭৪ থেকে বর্ষ ৭ সংখ্যা ৪ ১৩৭৫
৬। প্রেমলাল সিং একজন মস্কো-শিক্ষিত কমিউনিস্ট শারদীয় ১৩৭৫।
৭। ঊনিশশো সালের মেথর ও ঝাড়ুদারের আন্দোলন শারদীয় ১৩৭৮
৮। চিত্র ও সমাজজীবন বর্ষ ১১ সংখ্যা ৯-১০ ১৩৮০
৯। চেঙ্গাইল ও বাউড়িতয়ার ধর্মঘট বর্ষ ১১ সংখ্যা ৯-১০ ১৩৮০

দেশহিতৈষী

অভিনন্দন শারদীয় ১৩৭০
যাদের ফেলে এলাম। ১০ আশ্বিন ১৩৭০
এস এ ডাঙ্গে ও জাতীয় মহাফেজ খানা। ১৩৭১ (১ মে ১৯৬৪ চিঠি (কমরেড আবদুল রজ্জাক খানকে লেখা)। শারদীয় ১৩৭১
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ভিত্তি স্থাপন। শারদীয় ১৩৭৩

হঠকারীদের হঠাতে হবে। ২৩ আষাঢ় ১৩৭৪ পার্টিকে আরও সংহত করতে হবে। বর্ষ ৬ সংখ্যা ১৫ ১৩৭৫
মীরাট মামলার চল্লিশ বছর। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৩৭৬ অবনী মুখার্জির কথা। শারদীয় ১৩৭৬
নলিনী গুপ্ত সে বাস্তবে যা ছিল। বর্ষ ১০ সংখ্যা ৪। ১৩৭৯

শতাব্দী

শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত স্মরণে। বর্ষ ৫ সংখ্যা ৯ ১৩৬৭
রাজবন্দী। বর্ষ ৫ সংখ্যা ২ ১৩৬৮ সাংবাদিকতার এক অধ্যায় সংখ্যা ৯ ১৩৭১
কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মকদ্দমার স্মৃতি শারদীয় ১৩৭৩
মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা বৈশাখ ১৩৭৪

শলাকা

নিজেকে ক্ষমা করিনি শারদীয় ১৩৭৩ মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন, অগ্রগতির পথ ২ মাঘ ১৩৭৪
নির্বাচন শারদীয় ১৩৭৪
শ্রেণি সংগ্রাম শারদীয় ১৩৭৫

গণশক্তি

মজুর শ্রেণির আন্তর্জাতিকতা। লেনিন জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৭৭
স্মরণীয় ১৭ই অক্টোবর : প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দিন (সাক্ষাৎকার)। ৩০ আশ্বিন ১৩৭৭ (১৭ অক্টোবর ১৯৭০)

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

কিভাবে আমার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল। একসাথে মাঘ ১৩৮০
অভিনন্দন নতুন পত্রিকা বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ অগ্রহায়ণ ১৩৩২
দুর্যোগের পাড়ি। মোস্লেম ভারত। আশ্বিন ১৩২৭
প্রেমিকের পণ কোহিনুর (মাঃ নব পর্যায়) ২ অগ্রহায়ণ ১৩২২
বীর (কবিতা) আল এসলাম বর্ষ ১ সংখ্যা ৭ ১৩২২
উর্দু ভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান আল
এসলাম শ্রাবণ ১৩২৪ কৃতবিদ্যা মুসলমান ছাত্র প্রবাসী বর্ষ ১২ খণ্ড ২ অগ্রহায়ণ ১৩১৯
আবেদন মতামত বর্ষ ৩ সংখ্যা ১ পৌষ ১৩৫৯

অভিনন্দন শারদীয় মুর্শিদাবাদ বার্তা ১৩৭৮
নির্বাচন ও কমিউনিস্ট পার্টি শারদীয় খড়দহ থানা সমাচার ১৩৬৮
স্বাধীকারের প্রতি অভিনন্দন বাণী। স্বাধীকার ১৩৭৫
শুভেচ্ছা। অগ্নিকোণ। মে দিবস সংখ্যা বৈশাখ ১৩৭৬
কাজী আব্দুল ওদুদ। দেশ। ১২ আষাঢ় ১৩৭৭
একটি প্রতিবাদ যুগান্তর ২১ ফাল্গুন ১৩৭৮ (৫ মার্চ ১৯৭২)
অপ্রকাশিত চিঠি বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা ১৩৮২ সন্দীপে ইংরেজী শিক্ষা। সন্দীপ-হাতিয়া জনকল্যাণ সমিতি বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন স্মারক পুস্তিকা। ফাল্গুণ ১৩৭৯ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

নব রচিত শাসন পদ্ধতি (১৯৩৭ সালে বঙ্গ কৃষক সম্মেলন পঠিত ও গৃহীত) : প্রকাশিত - ১৯৪৪
প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন । প্রকাশিত ১৩৬৮ (১৯৬১)
ভূমিকা। মুক্তি যুদ্ধে আদিবাসী। প্রমথ গুপ্ত (ময়মনসিংহ) প্রকাশিত ১৩৭০

বিভিন্ন প্রকাশনা

ফরিদপুরের অভিভাষণ। কৃষক আন্দোলন বর্মণ পাবলিশিং ১৩৪৬
ভূমিকা। কয়েকটি কবিতা। বিমলচন্দ্র ঘোষ। টি ইউ প্রকাশনী। ১৩৬৬
একখানি চিঠি। অর্দ্ধশতাব্দী : ১৯১০-৬০ (স্মারকগ্রন্থ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত। ১৯৬৭
ভূমিকা। লেনিন-জন্মশতবর্ষ উৎসব স্মরণিকা ১৩৭৭
বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। অমর কৃষক নেতা বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়। ১৩৭৮
দু'টি কথা। নজরুল কথা — শান্তিপদ সিংহ। নবজাতক ১৩৭৯
ভূমিকা কাঁঠালের আমসত্ত্ব। দিগিন বন্দোপাধ্যায় ১৩৬৪ এ ছাড়াও গণবাণী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (২৭ শ্রাবণ ১৩৩৩) থেকে আশ্বিন ১৩৩৪ অবধি প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যায় ছোট বড় একশোটির ওপর অগ্রন্থিত লেখা ছড়িয়ে আছে।

অগ্রন্থিত ইংরাজি লেখা

A Successful Musalaman Student. The Modern Review. Dec. 1912, p 668.9
For the Statements of The Accused in the Meerut Conspiracy Case - 1929-33

From the Veteran Old Guard. National Front. February 25, 1938.
Ban On The Communist Party Must Go. National Front, Match 6,1938.
Our First Days. New Age. V. 7, No. 4 Apr. 1958. 13-31 pp.
Communist Party of India, Years of Formation 1921-33, Cal., N.B.A., 1959
November Revolution & Nazrul Islam. New Age; V. 8, No. 9. Sept. 1959. 211-16pp.
M.N. Roy's Letter. New Age; V. 8, No. 11, Nov. 1959. 38 - 42 pp.
The Communist Party of India And Its Formation Abroad. Cal. N.B.A. 1962.
S.A. Dange and the National Archives. Calcutta Venguard.
Communist Challenge Imperialism from the Dock, Introd. by Muzaffar Ahmad, Cal. N.B.A., 1967.
Myself & the Communist Party of India, 1920-29 Cal., N.B.A., 1970.
Proletarian Internationalism, People's Democracy,
Special Lenin Birth Centenary, April 22, 1970. 60-61p.
Letter - Com. Amir Chand Bombwal, Ed. Swarajya, 5.2.71

** উদ্ধার ও তথ্য সংকলন : শিবাদিত্য দাশগুপ্ত*